বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক

মোঃ আবু দাউদ

রেজিঃ নং-১৩২/১৯৯৯-২০০০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

465969

465969

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর, ২০০৯

465969

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

465969

উৎসর্গ

দোহাকে

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন" শীর্ষক এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই গবেষণা কর্মটি বা এর অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

465969

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ আবু দাউদ
রেজিঃ নং-১৩২/১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

UNIVERSITY OF DHAKA
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
DHAKA-1000, BANGLADESH

Dhaka University Institutional Repository

Phone : 9661900-73 Extn.6490
Fax : 880-2-8615583
E-mail : duregstr@bangla.net

Date :

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ আবু দাউদ কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গনতন্ত্রের জয় জয়াকার। আর গনতন্ত্রে বিরোধীদল অপরিহার্য। সে কারণেই "বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণা কর্মটির অবতারণা। তাই গবেষণার পরিসমাপ্তিতে গবেষকের কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গবেষণা কর্মে একজন গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরো অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান। শুধু সংশ্লিষ্ট গবেষকের পক্ষেই গবেষণা প্রক্রিয়ার সেই সব ব্যক্তিবর্গের অবদান অনুধাবন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যারা তাদের পরামর্শ, মতামত এবং সময়োচিত নির্দেশনার মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদেরকে আমি পূর্ণ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনকে, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, গঠনমূলক নির্দেশনা, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ এবং আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে পূর্ণ গবেষক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। তাঁর নির্দেশিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা ও তথ্য আমাকে গবেষক হিসেবে সুসজ্জিত করেছে।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি যিনি আমার সার্বিক খোঁজ-খবর ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন। আমি তার নিকট কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ব্যানবেইস লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার এ গবেষণাটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকের বই, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা ও গবেষণা প্রতিবেদনের সাহায্যে নিতে হয়েছে। সময়ের স্বল্পতা ও নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারণে আমি তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিতে পারিনি। এজন্য আমি তাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এছাড়াও সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের প্রতি, যাদের নিকট থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি। তারা ধৈর্য্য সহকারে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাকে সঠিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে।

ডিসেম্বর, ২০০৯

মোঃ আবু দাউদ
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-১৩২/১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	বিরোধীদলের ভূমিকা ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১২-২৫
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	স্বাধিকার আন্দোলনে বিরোধীদলের ভূমিকা	২৬-৭১
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিরোধীদলের ভূমিকা	৭২-৯১
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) সরকারী দলের কার্যক্রম ও বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা	৯২-১৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	"বি, এন, পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন" সম্পর্কিত জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ, সারসংক্ষেপ, উপসংহার ও সুপারিশমালা	১৭১-১৯৩
		সংযোজনী	১৯৪-১৯৬
		গ্রন্থপঞ্জী	১৯৭-২০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ ভূমিকা
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি
১.৪ গবেষণার কর্মপরিকল্পনা
১.৫ গবেষণা এলাকা
১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা ঃ

উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে বিরোধীদল একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিক গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয় । নতুন ধারায় জীবন-যাপন ও মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় জনগণ গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় লালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-নিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা শিল্পের বিকাশ তাদেরকে করে তোলে আধুনিক ও যুক্তিবাদী। এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপিয়ানদের দৃষ্টি পড়ে। তারা বাণিজ্যের নামে এসে এ অঞ্চলে গড়ে তোলে বিশাল সাম্রাজ্য। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ বৃটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। ইউরোপীয়রা নিজ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা করলেও উপনিবেশগুলোতে চলে তাদের নির্মম শাসন ও শোষণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপের রাজনীতিতে ঘটে বেশ কিছু ঘটনা। কার্ল মার্কসের বহু লালিত সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে রাশিয়ায় লেলিনের হাতে। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর 'বলশেভিক বিপ্লব' বিজয় লাভ করে। সূচিত হয় রাশিয়ার ভূখন্ডে সমাজতন্ত্রীদের বিজয় উৎসব। সিংহাসনচ্যুত হন দ্বিতীয় নিকোলাস। এদিকে জার্মান ও অটোম্যানদের বিরুদ্ধে বৃটেন ও তার মিত্রবাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাজয় ধ্বনি বাজতে শুরু করে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য যাতে ভেঙ্গে দেওয়া না হয় তার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে শুরু হয় খিলাফত আন্দোলন। ভারতীয় মুসলমানদের অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি। যুদ্ধের সময় উপনিবেশিক শক্তি বৃটেন অটোম্যান সাম্রাজ্য না ভাঙ্গার প্রতিশ্রুতি দিলে মুসলমানরা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পরিস্থিতি দাঁড়ায় ভিন্ন। বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। উপমহাদেশে শুরু হয় খিলাফত আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমান সবাই এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করে। এরপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং ক্রমেই তা স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে ভারতবাসী[১]। ১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিত্রবাহিনী কর্তৃক জার্মানির উপর যে অবরোধের বোঝা চাপানো হয়, ১৯৩৩ সালে এডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়ে শুধু দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি লংঘন করে থেমে থাকেননি, আরেকটি যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে [২]। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার অদম্য স্পৃহা তাকে সাহসী করে তুলে। সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে থাকে হিটলার বাহিনী। সে রণসজ্জায়

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করে প্রাচ্যের সমরবিদ জাপান ও ইউরোপের আরেক সমরবিদ ইতালির মুসোলিনি। ১৯৩৭ সালে Anti-Comintern Pact জার্মানি, ইতালি ও জাপানকে এক সুতায় গ্রথিত করে। বস্তুত ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে বিশ্ব দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল সংশোধনবাদী শক্তি জার্মানি, ইতালি ও জাপান এবং অন্যদিকে ছিল ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ক্রমেই তা মিত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হয়[৩]।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ইউরোপের আকাশে জমে উঠে কালো মেঘ। বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। একদিন খুব ভোরে জার্মান বাহিনী পোলান্ড আক্রমন করার সাথে সাথে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু, অজস্র ধ্বংসলীলা সাধনের পর যখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে, তখন ইউরোপে জার্মানি পর্যদুস্ত এবং প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমানবিক বোমার কাছে জাপানিদের অসহায় আত্মসমর্পণ। পাঁচ বছরের ধ্বংসলীলা, অগ্নিশিখা ও অসংখ্য মানুষের মৃত্যু বিশ্ববাসীকে করে তোলে ভীতসন্ত্রস্ত। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি তাই বিশ্ববাসীর কাছে এক মহামুক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরিসমাপ্তি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতে থাকে। জাপানিরা চলে আসে মার্কিনিদের করতলে। জার্মানি হয় দ্বি-খন্ডিত। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৯ সালে পারমানবিক বোমার অধিকারী হয়। বিশ্বে সৃষ্টি হয় দ্বি-মেরু ব্যবস্থার। সোভিয়েতরা চেয়েছিল বিশ্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে, আর আমেরিকান নীতি ছিল অবাধ ও মুক্ত গণতন্ত্রের পক্ষে। এভাবে উভয়ের মাঝে শুরু হয় মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের। আর এই দ্বন্দ্বই এক সময় বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। স্নায়ুযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে কোরীয় উপদ্বীপের যুদ্ধে। তারপর ভিয়েতনামের প্রলম্বিত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধে আনে নতুন মাত্রা। মার্কিনীদের পরাজয় ঘটে এই যুদ্ধে। এর পূর্বে আরেক দেশ কিউবায় ১৯৫৯ সালে পৌছে যায় কমিউনিজমের নতুন বার্তা। মার্কিন দোসর বাতিস্তুতাকে পরাজিত করে ফিদেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতা দখল করেন । এক পর্যায়ে ১৯৬২ সালে ক্যারিবিয়ান দ্বীপে মহাসংকটের সৃষ্টি হয় যখন সোভিয়েতরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ের কাছে স্থাপন করে মিসাইল। এভাবে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়কে আড়ষ্ঠ করে রাখে। বিশ্বে ঠান্ডা লড়াই চলতে থাকে বিরামহীনভাবে। এ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তজাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে দুই পরাশক্তির মধ্যকার ঠান্ডা লড়াইয়ের পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন জাতিসমূহের আত্মপ্রকাশ আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত হয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন। এ সম্মেলনে উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতার দাবি তলে। ফলে দু'দশকেরও কম সময়ের মধ্যে এ দুটো মহাদেশে ৬০ টিরও বেশি দেশ উপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে

Dhaka University Institutional Repository

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেশের পরাধীনতার গ্লানি মোচন করে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার লাভের আর কোনো নজির নেই। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে [৪]।

১৯২০ এর দশকে ভারতবর্ষের আন্দোলন জাতীয় রূপ লাভ করে এবং এ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলন ভারতবর্ষে বৃটিশদের ভীতকে নাড়িয়ে তোলে এবং ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক ইতিহাস দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই পাকিস্তানে সামরিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগন স্বাধিকারের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফা স্বাধিকারের দাবিকে আরো বেগবান করে তোলে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগনের লালিত স্বপ্ন, স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ নামক এক নবীন রাষ্ট্রের। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের কিছুকাল পরেই নবীন রাষ্ট্রে ঘটে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। সর্বশেষ সামরিক শাসনই যেন জুটে যায় এ দেশবাসীর ললাটে স্থায়ীভাবে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে দেশের জন্ম, সে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্খা তথা মৌলিক অধিকার রক্ষিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পদতলে পিষ্ট হতে থাকে এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা। ১৯৮০ এর দশকে পূর্ব ইউরোপীয় আন্দোলনের সাথে বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৮০ এর দশকের প্রারম্ভে পোলান্ডে শুরু হয় সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভের আন্দোলন। লেস ওয়ালেসা 'সংহতি আন্দোলনের' মাধ্যমে যে মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন তা ক্রমেই পূর্ব ইউরোপের গণমুক্তি আন্দোলনে দারুন প্রভাব ফেলে। ১৯৮৯ সালে জুন মাসে সোভিয়েত নেতা পশ্চিম জার্মান সফরে গেলে যে সোভিয়েত-পশ্চিম জার্মান যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়, তাতে পরিস্কারভাবে বলা হয়, সকল জাতি এবং দেশের স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারনের অধিকার আছে। ক্রমান্বয়ে পূর্ব জার্মানির ব্যাপারে সোভিয়েত নীতিতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। উক্ত বছরের ৯ নভেম্বর বার্লিন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়। দুই জার্মানির একত্রীকরণ সম্পন্ন হয় ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর। জার্মানদের মাঝে বিদ্যমান শত্রুতার অবসান ঘটে। জার্মানি ফিরে আসে উদার গণতন্ত্রে। আশির দশকের শেষে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। 'মখমল বিপ্লব' (Velvet Revoluation) এর মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিষ্ট বিরোধী আন্দোলন সেদেশের জনগনকে দারুনভাবে জাগিয়ে তুলে। এভাবে পূর্ব ইউরোপে

Dhaka University Institutional Repository

এবেস্র পর এফ দেশে আন্দোলন যত তীব্র হতে থাকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ততই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙ্গে যায় । দীর্ঘকাল কমিউনিষ্ট শাসনের নাগপাস থেকে মুক্ত হয় পূর্ব ইউরোপ এবং যেখানে গণতন্ত্রেও সুবাতাস বইতে শুরু করে (৫)।

স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে মার্কিনিদের বিজয় সূচিত হয়। গণতন্ত্রের উদার হাওয়া বিশ্বকে আন্দোলিত করে তোলে। সে আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও। ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের সূচনা হলে গণতন্ত্রের মুখ থুবড়ে পড়ে। গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলিত হতে থাকে সারাদেশ। ১৯৮০ এর দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী দলগুলো ইস্পাত কঠিন ঐক্যের সৃষ্টি করে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে। ১৯৯০ সালে স্বৈরচার এরশাদ তীব্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। আর প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আর্বিভূত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। শুধু বিরোধী দল বললে ভুল হবে, বাংলাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে আওয়ামী লীগ; যে দলটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রাখে, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে স্বাধিকারের প্রশ্নে বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলটির প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে সাহসিকতার সহিত নেতৃত্বদান করে স্বাধীনতা অর্জন করেন। সেই দলটিই ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হলেও প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো গবেষকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। বিশেষত ১৯৯১-৯৬ সময়কালে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা গবেষণাধর্মী আলোচনার মাধ্যমে বের করা অতীব জরুরী। কেননা, গনতন্ত্র উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে একটি রাষ্ট্রে প্রধান বিরোধী দল কী ধরনের ভূমিকা লালন করে তার উপর সে দেশের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের যে কোন নবীন গনতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা ইতিবাচক না হলে রাজনীতিতে যেমন আসে অস্থিতিশীলতা তেমনি অর্থনীতির উপর পড়ে নেতিবাচক প্রভাব। ১৯৯১-৯৬ বি.এন.পি'র শাসনামলে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বিশ্বায়নের যুগ মানে উদার গণতান্ত্রিক ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। গণতান্ত্রিকভাবে একটি দেশ যত উদার ও স্বচ্ছ হবে, সে দেশের অর্থনীতি ততই বেগবান হবে। বেগমান হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। মুক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির দেশে প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা, সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে মতৈক্য। বিরোধী দল মানেই সব বিষয়ে বিরোধিতা করবে তা কিন্তু নয়। গঠনমূলক রাজনীতিতে বিরোধী দল একটি দেশের রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অবশ্য এটা নির্ভর করে বিরোধী দলের কর্মকান্ডের উপর। ১৯৯১-৯৬ সময়কালে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা এই গবেষণায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখার প্রয়াস পাই। এ দেশের গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা কতটা গঠনমূলক তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। বিরোধী দলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো দেশে ভয়াবহ অস্থিতিশীলতা বয়ে আনে। তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করেছে, সংসদ এনেছে অনাস্থা প্রস্তাব, হরতাল শুধু রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতাই ডেকে আনেনি, অর্থনীতিকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগ সে সময় আন্দোলন করেছে। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল রাজনীতিকে চাঙ্গা করেছে । ১৭৩ দিন হরতাল ডেকেছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের দীর্ঘ আন্দোলন কতটা যৌক্তিক ছিল তা প্রশ্নমালার মাধ্যমে জানার চেষ্টা থাকবে। বস্তুত বিরোধী দলের কার্যক্রম তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু হয়। মূলতঃ ১৯৯১-৯৬ সালে আওয়ামী লীগের ভূমিকা পরবর্তীতে বিরোধী রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে সে সময়ে আওয়ামী লীগ কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিল তা গবেষণার উত্তম বিষয় হওয়া এই জন্য অপরিহার্য যে বিরোধী দলের রাজনীতির নেতিবাচক দিকগুলো সনাক্ত করে তা পরিহারের সুপারিশ করা। অর্থনৈতিকভাবে একটি দেশকে স্বাবলম্বী হতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। প্রয়োজন সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা। অতএব এ দিক নির্দেশনার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম। গবেষণা কর্মকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রয়োজন গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা বিষয়টি যথাযথভাবে বিশ্লেষনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস সমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের বই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন গবেষনের গবেষণা কর্ম, ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য রাজনীতিক যারা সরকারি দল ও বিরোধীদলে বর্তমানে আছেন এবং তখনও ছিলেন এমন ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও একটি জরিপ কার্য পরিচালনা। মাঠ পর্যায়ে নমুনা জনগোষ্ঠী ছিলেন ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর মানুষ। এদের মতামত জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নমালা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমন্বিত করা হয়েছে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ এবং তা প্রয়োজনীয় স্থানে যথাযথভাবে সংযোজিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার কর্মপরিকল্পনা ঃ

"বিএনপি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা একটি তথ্য উদঘাটনমূলক জরিপ। এ গবেষণা কর্মকে বাস্তব সম্মত করার প্রয়াসে জরিপের আশ্রয় নেয়া হয়। যে কোনো গবেষণা কর্মকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজন জরিপ পরিচালনা। জরিপের মধ্য দিয়ে বিষয়টির প্রকৃত তথ্য বের হয়ে আসে এবং সে তথ্যের ভিত্তিতে দিক নির্দেশনা দেওয়া যায় সহজেই। আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু রাজনীতি সংশ্লিষ্ট তাই এ গবেষণা পরিচালনায় প্রয়োজন যথাযথ কর্মপরিকল্পনা। একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ছাড়া গবেষণা কর্ম তার গতি হারায়, কর্মপরিকল্পনাই গবেষককে সুনির্দিষ্ট পথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

এই গবেষণায় মাধ্যমিক উৎস সমূহের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যেমন যথাযথভাবে ঠিক তেমনি বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের মাঝে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এ জরিপ কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা দারুন ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ যেহেতু জরিপে অংশ গ্রহন করেছেন তাই প্রথমে তাদের পেশার ধরন সনাক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আইনজীবীদের এক কাতারে রাখা হয়েছে এবং জরিপে তাদের অংশ গ্রহণ মোট ৩৫ জন, চাকুরীজীবী (সরকারি কিংবা বেসরকারী) এই শ্রেণীভুক্ত করা হয় ২৫ জন, আর রাজনীতিবিদ ও সক্রিয় কর্মী যাদের অংশগ্রহন ২২ জন , ব্যবসায়ীদের অংশ গ্রহণ ১৩ জন এবং বাকি যারা আছেন তারা অন্যান্য পেশার। তাদের পেশা সনাক্ত করা হয়নি। এদের অংশ গ্রহন ছিল ৫ জন। এভাবে গবেষণার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে এই গবেষণা কর্মকে সাফল্য মন্ডিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণা এলাকা ঃ

যে কোনো গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট এলাকা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট এলাকার জরিপ কার্য পরিচালনা করে সঠিক তথ্য উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত দিক নির্দেশনায় উপনীত হওয়া যায়। 'বি.এন.পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিরোধী দলের ভূমিকাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলের যেমন গঠনমূলক ভূমিকা অপরিহার্য ঠিক তার অগণতান্ত্রিক আচরণ ও ভূমিকার জন্য সমালোচনার মুখামুখিও হতে হয়।

গবেষণার বিষয়টি যেহেতু রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে বাঁধা, তাই এ গবেষণা কর্মের জন্য এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এমন অতীত ঘটনাবলী খুব কম মানুষেরই স্মৃতিতে আটকে থাকে। ঢাকা বাংলাদেশের ব্যবসা-বানিজ্য, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রাণকেন্দ্র। তাই এখনকার বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত বেশি সচেতন। রাজনীতি সচেতনতার মাত্রাও বেশি। তাই এই গবেষণার এলাকা হিসেবে রাজধানী ঢাকাকে নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

"বি,এন,পি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে নানা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়, সীমিত আয়োজন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা গবেষণা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এছাড়া আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হলে বিরোধী দলের ভূমিকাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে বেঁধে দেওয়া। এর ফলে জরিপ কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যুবক শ্রেনী তথা ছাত্রদের মতামত পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। কেননা বিষয়টি যেহেতু অনেক আগের (১৯৯১-৯৬) তাই বর্তমানের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সে সময়ের বিরোধী দলের ঘটনাবলী তথা জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিল না। কারণ তাদের বয়স ছিল খুব কম।

স্বভাবতই জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অথচ তরুন প্রজন্মের মতামত জাতীয় স্বার্থে অতীব প্রয়োজন। কেননা তরুন সমাজই জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। এ সীমাবদ্ধতা কারণে এই গবেষণার জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে ত্রিশোর্ধ বয়স্কদের মাঝে। সাধারণভাবে ধরে নেয়া যায় যে, এখন যাদের বয়স ৩০ (ত্রিশ) এর উপরে

Dhaka University Institutional Repository

তারাই কেবল সে সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতনা ছিলেন। হয়তো অনেকে স্মৃতিভ্রম হয়ে থাকবেন।

আবার বিভিন্ন স্তরের মাত্র কিছুসংখ্যক মানুষের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। তাই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গৃহীত সাক্ষাৎকার অনেকাংশে যথেষ্ট পরিমান প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে। যাই হোক প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকার দাতাগনের মতামত নিঃসন্দেহে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

২. মোঃ আব্দুল হালিম, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৭

৩. মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯

৪. মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৫

৫. মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিরোধীদলের ভূমিকা ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

২.১ বিরোধীদলের সংজ্ঞা

২.২ বিরোধীদলের ভূমিকা

২.৩ বিরোধীদলের ধরন

২.৪ বিরোধীদল আওয়ামী লীগের জন্ম ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

২.১ বিরোধীদলের সংজ্ঞা ঃ

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্র বিকাশের সাথে সাথে বিরোধী দল একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষতঃ যে দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, বিরোধী দলের মর্যাদা সেখানে নিরুপিত হয় নিপুনভাবে। আধুনিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই বিরোধী দলের সহযোগিতা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারন, কার্যপ্রনালী প্রনয়নের ক্ষেত্রে সরকারী দলের সাথে বিরোধীদলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক এলিট শ্রেনী এবং সকল মত ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক পক্ষকে সরকার পরিচালনা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করা যায় না, তাই সকল ব্যবস্থায় সরকার বিরোধী পক্ষের সৃষ্টি হয়। বস্তুত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি Check and Balance এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দরকার বিরোধী দল।

বিশেষজ্ঞদের মতামত ঃ

Opposition বা 'বিরোধী' এর সংজ্ঞা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন-এনসাইক্লোপিডিয়া, অভিধান বই, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকদের লেখায়।

Grolier Encyclopedia তে বলা হয়েছে, 'the name opposition is given to a party that is out of power and that exists mainly for the purpose of the criticizing the party in power if possible supplanting it' [১]

Opposition কে, Universal Dictionary of English Language-এ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'As a body of indicviduals who hold opposing views to a decision or policy and as part of Parliamentaries they are opposed to the government' [২]

Oxford Advanced Dictionary তে বলা হয়েছে 'Opposition as the majority and minority members of a political party in the congress holding political views opposed to the president and his executive department; in the context of parliamentary System it mentions that opposition include the political party opposed to the government and offers itself to replace the rubbing party whenever necessary' [৩]

Dhaka University Institutional Repository

Penguine Dicstionary of Politics এ বলা হয়েছে 'An opposition is political grouping, party or loose association of persons who wish to change the government and after its policy decision' (৪).

রবার্ট এ. ডাল বলেছেন যে, সংগঠিত বিরোধী দলের অধিকার ভোটারদের নির্বাচনে ও সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। ইহাই গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে মাইলফলক হয়ে আছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বৈধ, নীতিগত এবং শান্তি পূর্ণ মনোভাব সম্পন্ন রাজনৈতিক দল খুব কমই দেখা যায়।

বর্তমান যুগে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়াস রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংগঠিত বিরোধী দল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পার্থক্য ও সমাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতি খোঁজা এবং নাগরিকের কাছে তাদেরকে বিকল্প সরকার হিসেবে উপস্থাপন করা।

Lame এবং Erosson বলেন, 'Democracies not only offer freedom of thought, speech and contract but faster the autonomy of organization and political institutions' (৫)।

Gaglielmo Ferrero বলেন, 'In democratic country the opposition is an organ of popular sovereignty just as vital as the government to suppress the opposition is to suppress the sovereigaty of the people'

A.D Lindsay এর মতে, Good representative System requires not only a strong opposition. It needs also that the opposition should be an alternative government; thus representative political democracy involves differences and opposition' (6)

গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা মত প্রকাশ করেন যে, গনতন্ত্র হলো ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি পদ্ধতি এবং বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ছাড়া গনতন্ত্র হতে পারে না। এভাবে গনতন্ত্রে বিরোধী দল সম্পর্কে অনেক তাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ করেছেন।

James L. Gibson বলেন, 'Tolerance is typically thought to be an essential ingredient of democratic politics. Without toleration of opposition widespread contestation is impossible, regime Legitimacy is imperiled and no conformity prevails' (৭)

Dhaka University Institutional Repository

Earnest barker এর মতে, 'Democracy liberates opposition and that the essential feature of democracy is the presence of opposition which may be in the electorate, in parliament and even in the anti cabinet which confronts and challanges the Cabinet' (৮)

Michael Curtis মনে করেন, 'The crucial element in a parliamentary democracy is the existence of a legal opposition which is not only tolerated but sometimes may select the subject and opportunities for debate and provide an impact on the government actions and decisions'.

সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ের একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করা উচিৎ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিকার থাকে যে, তারা নির্দিষ্ট সময়ে দেশ শাসন করবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ বা বিরোধী দলের অধিকার থাকে যে, ক্ষমতাসীন দলের অপারগতা নাগরিকদের ধরিয়ে দেবে এবং সরকারের ত্রুটিসমুহ তুলে ধরবে। এভাবে বিরোধী দল জনগনকে নিজেদের পক্ষে পরিচালিত করার চেষ্ঠা করবে। যাতে জনগন সরকারের বিপক্ষে যায় এবং পরবর্তী সময়ে তারা ক্ষমতায় আসতে পারে। এভাবে সরকারি দল ও বিরোধী দল উভয়ই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন অব্যাহত রাখতে পারে।

২.২ বিরোধীদলের ভূমিকাঃ

পৃথিবীর সব গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারী দলের বিকল্প হিসেবে স্বীকৃত। বিরোধী দলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহন ছাড়া সংসদীয় গনতন্ত্র চলতে পারে না। বাংলাদেশ একটি গনতান্ত্রিক দেশ। যে কোনো গনতান্ত্রিক কাঠামোতেই সরকারি দল ও বিরোধী দলের সমঝোতার প্রয়োজন। এ ধরনের সমঝোতা ছাড়া গনতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা একত্রিত হয়ে জাতীয় নীতি প্রনয়ন করেন। বিরোধী দলের অংশগ্রহন ব্যতীত কখনও জাতীয় নীতি গড়ে ওঠতে পারে না। অথবা এ ধরনের কোনো নীতি প্রনীত হলেও তার কোনো গ্রহনযোগ্যতা থাকে না। এ কারনে গণতন্ত্রের স্বার্থে বিরোধী দলের উপস্থিতি প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক সমাজে বিরোধী দলের প্রতি পরোক্ষভাবে সরকার গঠনের দায়িত্ব বর্তায়। বিরোধী দল এ জন্যই গঠন করে ছায়া মন্ত্রীসভা যা সরকারি মন্ত্রীসভার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। Sir Jennings এ প্রসঙ্গে বলেন, তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গনঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল না থাকলে গনতন্ত্র হয় না। বৃটেনের মহামান্য রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারি দলের মতোই। আবার বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ট দলের শাসনকে মেনে নিতে না পারলে সংসদীয় গনতন্ত্র কার্যকর হবে না।

Gilbert Campion সংসদীয় বিরোধীদের সম্পর্কে বলেন, 'The Opposition is the party for the time being in the minority organized as a unit and officially recognized, which has had experience of office and is prepared to form a government when the existing ministry has lost the confidence of the country. It must have a positive policy of its own and not merely oppose destructively' [৯].

বিরোধী দলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিহত করে। তাছাড়াও যে বিষয়ের উপর Sir Jennings গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো 'The Prime minister meets the convenience of the opposition and the leader of the opposition meets the convenience of the government'.

সরকারকে সহযোগিতা করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দল সরকারের দুর্বল ও খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করে এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সরকারের পক্ষে একক ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বৈরতান্ত্রিক আচরন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এজন্যই Earnest Barker বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'Safety Valve' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিরোধীদল সরকারের বিরোধিতা করবে। তবে বিরোধী পক্ষকে সংযত, পরিশীলিত ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

Earnest Barker এর মতে 'Opposition can not be utterly negative, entirely critical or totally obstructive since, in democrcy, the function it performs is fundementally positive'

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো সংগঠিত বিরোধী দলের গুরুত্বও কম নয়। Michael Curtis বৈধ ও সাংবিধানিক বিরোধী দলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে বলেন 'Her Majety's Opposition' যা ১৮২৬ সালে বৃটেনে প্রথম ব্যবহৃত হয়। বৃটেনে এর আনুগত্য রয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর শৃঙ্খলা ও গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থায় বির্তক ও আলোচনার অধিকার স্বীকৃত বলে বিরোধী দল প্রায়ই সুযোগ খুঁজবে সরকারের ব্যর্থতা, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার জন্য। তারা সরকারি দলের পাবলিক পলিসি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভূল-ত্রুটি তুলে ধরবে এবং যুক্তির মাধ্যমে জনগনকে এমন ধারণা দেবে যে, ক্ষমতায় গেলে তারা ক্ষমতাসীন দলের চেয়ে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে।

একটি কার্যকরী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে তার কার্যক্রমের সীমা লংঘন করা থেকে নিয়ন্ত্রনে রাখে, তার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, জনগনের দাবিতে সাড়াদানকারী হিসেবে গড়ে তোলে এবং ভালো কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করে তোলে। দেশের সার্বিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ জনগণকে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া বিরোধী দলের দায়িত্ব এবং সরকারি দলকে নিয়ন্ত্রন করতে জনমত সংগ্রহ করাও এর কাজ। দেশ যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর সম্মুখীন হয় বিরোধীরা সেক্ষেত্রে জনগনকে সচেতন করে তোলে।

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে, দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে, বিরোধীদের সরকারি দলের পাশে থেকেই সকল নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা উচিত। গণতন্ত্রে বিরোধীদেরকেও গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দেয়া উচিত। কেবলমাত্র সরকারের ত্রুটি না ধরে তাদেরকে সকল কাজে সহযোগিতার মানসিকতা পোষন করা এবং জনগনের কল্যাণের কথা ভেবে উদার মানসিকতায় পরিচয় দেয়াই বিরোধীদের দায়িত্ব। গণতন্ত্র যেমন সবার তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনীতি হওয়া উচিত সরকারি দল ও বিরোধী দল সবার অংশগ্রহণ ভিত্তিক। যেখানে মূখ্য উদ্দেশ্য থাকবে জনকল্যাণ। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের সমঝোতাপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ বিরোধীদলের ধরন ঃ

বিরোধী দলের ধরন বা প্রকারভেদ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন ঃ সাংবিধানিক কাঠামো, দলীয় পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি। সংসদীয় পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতিতে বিরোধীদের কার্যকলাপে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। বিরোধীরা রাষ্ট্রপতি শাসিত গনতন্ত্রের চেয়ে সংসদীয় গনতন্ত্রে অনেক বড় ও বাস্তব ভূমিকা পালন করে। সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি ছায়া কেবিনেট থাকে যা রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতিতে থাকে না। এ পদ্ধতিতে বিরোধী নেতাকে বিশেষ পদমর্যাদা দেওয়া হয়। আবার দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধীদের পৃথক ক্ষমতা, মর্যাদা ও অবস্থান আছে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধীরা খুবই শক্তিশালী এবং বিকল্প সরকার হিসেবে কাজ করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

Dodd mentioned that governments in multi party parliaments must be minority cabinets, coalition cabinets or both occurring in socially fragmented societies [10].

Powell noted that majoritarian political systems tend to bring about two party competitions that leave no space for extremist parties in opposition where as representative party systems, multi party systems, characterized by fractionalization offer a real opportunity for such parties.

এই পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের সাথে বিরোধীদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন-আনুগত্য প্রদর্শন, বিরোধিতার প্রকাশ্য বা দ্বন্দ্বমূলক।

According to Dahl in at least six important ways oppsition may differ. These include:

1. Organizational cohesion or concentration of the opponents
2. Compertitiveness of the opposition.
3. Site or setting for the encounter between opposition and those who control the government.
4. Distinctiveness or identifiability of the opposition.
5. Goals of the opposition and
6. Strategies of opposition. [১১]

Dhaka University Institutional Repository

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বিরোধীদের ধরন বা আচরন বিভিন্ন রকমের বৈষম্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয়, যেমন-অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য, সামাজিক অবস্থান, ভাষাগত দিক এবং জাতিগত গ্রুপ, ধর্ম ও আঞ্চলিক ব্যবধান এ সবকিছু।

এছাড়াও বিরোধীদেরও শ্রেনী বিভাগ করতে গিয়ে আরো উল্লেখ করা যায় ঃ সক্রিয় বিরোধী, নিষ্ক্রিয় বিরোধী, বিভাগীয় বিরোধী, নিয়ন্ত্রণবর্তী বিরোধী, একঘেয়েমি বিরোধী, মৌলিক বিরোধী এবং প্রকৃত বিরোধী।

উন্নত ও উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে বিরোধী দল ঃ

উন্নত ও অনুন্নত বিশের রাজনীতিতে বিরোধীদলের ভূমিকা, অস্তিত্ব ও বিবর্তনে পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়। নিচে এই দু'ধরনের বিরোধীদলের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

বৃটেনে বিরোধীদলের রাজনীতি ঃ

Her Majesty's loyal opposition in U.K বৃটেনে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র থেকে সীমিত সরকারে রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লিয়েছে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা আইন, ১৬২৮ সালের অধিকারের সনদ, ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব, ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন বৃটেনে সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিবর্তন এনেছে এবং সর্ববিধানে বিরোধীদলের স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৮২৬ সাল থেকে তার রাজকীয় ক্ষমতার বিরোধীরা সবার কাছে পরিচিত হতে থাকে । দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এটাই বুঝায় যে, রাজকীয় ক্ষমতায় বিরোধীরা এখনকার মত বিকল্প সরকার হিসেবে ছিল না। শক্তিশালী, শৃঙ্খলাপূর্ন এবং সংগঠিত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে বিরোধীরা কার্যকরী বিকল্প সরকার হিসেবে উঠে এসেছে। বৃটেনের বিরোধী নেতা অফিসিয়াল মর্যাদার অধিকারী এবং সংসদে বিরোধী দলকে এবং সরকার ব্যবস্থায় ছায়া কেবিনেটকেও তিনি পরিচালনা করেন।

S.E Finer mentioned that opposition in Britain is well organized to pose a challenge to the government in the parliament. It is continuous and as such permanent, it is representative with its party followers; It is alternative government as it takes over with the fall of the government and it is a participant in the government performance in the legislature. [12]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করা যায় যে, রাজা বা রানীর ক্ষমতায় বিরোধীরা বৃটিশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সমালোচনা করা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা, কেবল সরকারকে বাধা দেয়া বা বিঘ্নিত করা তাদের কাজ নয়। সংসদীয় বির্তক ও আলোচনার অধিকাংশ ব্যাপারে সামনে চলে আসে দুইটি পক্ষ সরকারী দল ও বিরোধী দল। বৃটেনে সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষমতাসীন দল সবসময় বিরোধীদলের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে।

Curtis stated that opposition in British political system attempts to amend or moderate the policy and legislation of the party in office.

K.C Wheare illustrated that opposition in Britain means that it is constitutional as well as Loyal;

যদিও বিরোধীদের মাঝে ক্ষমতাসীন দলের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিরোধ থাকে, তবুও তারা রাজনৈতিক নিয়মে সরকারের সাথে একমত, শাসন ব্যবস্থা ও সরকারী কার্যক্রমে তারা এক এবং তাদের কাছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে দলীয় কার্যক্রমের উর্ধ্বে।

বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাল কাজ করে এবং বৃটেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিরোধীদল ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক দেশ যার ভিত্তি সংবিধানে বিধৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, যা ১৭৮৯ সালে গৃহীত। যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তিনটি বিভাগই যেমন আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তবুও সম্পূর্ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য নীতির উপর নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নকারীরা একটি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার তৈরী করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের নিয়মিত ব্যবধানের পর নির্বাচন পদ্ধতি তৈরি করে গেছেন কিন্তু রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেননি। Parties originated during that administration largely in support of or in opposition to its policies[১২] বহু বছর যাবৎ এদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে দ্বি-দলীয় প্রতিযোগিতায় রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

While commenting on the opposition in the United States K.C wheare stated that there is a government of the U.S.A and there is plenty of opposition to it and there is plenty of people to lead this opposition

আমেরিকায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান, একদলের প্রাধান্য থাকে এবং অন্যদল নিজেদেরকে বিকল্প বলে মনে করে। এভাবে আমেরিকায় বিরোধীরা স্বীকৃত ও বৈধ। তবুও কোন বিরোধী দলীয় নেতা নেই। বৃটেনের মত নয়, আমেরিকায় দুই দলের কংগ্রেস সদস্যরাই রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে এবং তার কার্যাবলী প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

ভোটারদের মধ্যে স্থির সমর্থন ও আনুগত্য থাকায় জন্য আমেরিকার দলগুলো বিরোধীদের জন্য একটি ভিত্তি যোগাড় করে। পার্টির মধ্যে বিদ্যমান এমন আনুগত্য কখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে পারে না।

Dahl mentioned the following normal patterns of oppositions in the United States:

(1) Opposition seeks limited goals that do not directly challenge the major institutions or prevailing American beliefs.

(2) Opposition employ a wide variety of strategies combining a heavy emphasis on bargaining and pressure group activities in policy formulation

(3) Oppositions are not usually very distinctive and are not even clearly identifiable as oppositions; they are thus melt into the system.

(4) Oppositions are not combined into a single organization; they usually work through one or both major parties; these parties are highly competitive in national elections but in congress they are both competitive and cooperative.

(5) Opposition try to gain their objectives by seeking out encounters with decision makers at different bureaucratic, judicial & congressional on local levels.

বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে এটা মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধীদলের কার্যাবলী কেবলমাত্র দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উভয় দলের কংগ্রেস সদস্যরা প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা সাংবিধানিক কাঠামো ভিন্ন, যথা সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত। কিন্তু দুই দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেয় ও অন্য দল বিরুদ্ধ সরকার হিসেবে মনে করে এবং উভয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিরোধীরা বৈধভাবে সংগঠিত।

অনুন্নত গণতন্ত্রে বিরোধীদল ঃ

পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত না হওয়ায় উন্নয়নশীল সমাজে কখনও কখনও সম্পূর্ণ বিরোধী চিত্র দেখা যায়। অনুন্নত বিশ্বের অনেক দেশ উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপনিবেশিক ক্ষমতার পথ গ্রহণ করেছে। অনুন্নত সমাজের নেতাদের জন্য দ্রুত আধুনিকায়ন, স্থায়ীত্ব, সংহতি ও উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা উপনিবেশিক ক্ষমতায় রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সাংগঠনিক আয়োজন একটি আর্দশ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু দেখা গেছে এই সমাজেও অনেক দেশই এই গণতান্ত্রিক চর্চা করতে গিয়ে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অনুন্নত গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক চর্চার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখানে দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সংহতির উপস্থিতি কম। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতাপূর্ন মনোভাবের চেয়ে রেষারেষি, কোন্দল এগুলো বেশী প্রধান্য পায়। দেশের বা জনগণের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ তথা ব্যক্তি স্বার্থকে তারা বড় করে দেখে। দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে একই মনোভাব খুব কমই দেখা যায়। গণতন্ত্র যেখানে জনগণের জন্য, দল সেখানে দলীয় নেতাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। বিরোধীরাও হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়। সর্বোপরি অনুন্নত দেশগুলোর গণতান্ত্রিক আদর্শে বিরোধী দলের ভূমিকা নেতিবাচক।

২.৪ বিরোধীদল আওয়ামী লীগের জন্ম ইতিহাসঃ

আমরা জানি যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে। আমরা এও জানি যে, মুসলিম লীগ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এবং স্বাধীনাত অর্জন করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম লীগ তার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। বস্তুত ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তিরোধানের পর থেকেই মুসলিম লীগ তার পূর্ব খ্যাতি ও সুনাম হারাতে থাকে। এতদসত্ত্বেও কেন্দ্র ও প্রদেশে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিম লীগ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগই পরিষদের সব মুসলিম ভোট লাভ করেছিল। তখন বিরোধী দল বলতে হিন্দুদের সর্মথনপুষ্ট পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসকেই বোঝাতো। স্বভাবতই এ দলটি তেমন সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানকী শরীফের পীরকে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করায় দল থেকে বের হয়ে মুসলিম লীগের বিপক্ষ বিরোধী দলে যোগদান করেন। পাকিস্তানে যখন এমন অবস্থা বিরাজমান তখন প্রাক্তন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটি বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেন। তিনি দেখলেন যে, মুসলিম লীগ পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগনের দল না হয়ে বরং মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী ধনীক শ্রেণীর দলে পরিনত হয়েছে। এ অবস্থাদৃষ্টে তিনি ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার মোগলটুলিতে এক শ্রমিক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি বিরোধী দলের গোড়াপত্তন করেন। সেই থেকে জন্ম নিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানে এক সুসংহত বিরোধী রাজনৈতিক দল- আওয়ামী মুসলিম লীগ।

নব গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। দলের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান এবং আবুল মনসুর আহমেদ। জনাব শামসুল হক ছিলেন দলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। দলের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন শেখ মুজিবর রহমান, রফিকুল আহসান ও খন্দকার মোস্তাক আহমেদ।

আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠিত হয় মূলতঃ দুটো ভিন্নমুখী শক্তির উপর ভিত্তি করে। এর একদিকে ছিলেন কতিপয় হতাশাগ্রস্ত ও দলত্যাগী সদস্য, যারা মুসলিম লীগ থেকে সম্পূর্ন পৃথক ছিল না। অপরদিকে ছিলেন অসংখ্য যুবক কর্মী ও সমর্থক যারা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ন উদার ও ধর্ম নিরপেক্ষ এবং তারা দেশের সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তারা দলের সাম্প্রদায়িক নামকরনের বিরোধীতা করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার দাবী জানান। কিন্তু মাওলানা ভাসানী বেঁকে বসেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তখনও জনগণ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতা উর্ধে ছিল না। কাজেই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষেই সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান এ প্রত্যাবর্তন করে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলে যোগদানের পর থেকেই তা শক্তিশালী ও সুসংহত বিরোধী দলে পরিনত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে এবং একটি সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ দল হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

1. Grolier Encyelopedia, (New York and Torento, The Grolier Society Publishers 1958) P-139.
2. The Universal Dictionary, The English Language, P-804
3. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford, Oxford University Press, 1974) P-589.
4. Dictionary of Politics (London, Penguine Books, 1986) P-273.
5. Jan-Enik Lave and Svant O. Errosson, Politics and Society in Western Europe(London: Sage Publications, 1987) P-16
6. A.D Lindsay, The Essential of Democracy (London: Oxford University Press, 1929)
7. James L. Gibson, Democratic Values and Transformation of the Soviat union, The Journal of Politics Vol. 57, May 1992
8. Earnest Barker, Reflections in Government London Oxford university Press, 1942, 1967 Page, 202-203
9. Grilbert Campion, Development in Parliamentary System since 1918 in British Government, P-19
10. C. Dodd Coalition in Parliamentary Government, Princeton University Press, 1976.
11. Robert A. Dhal, opp.cit. P-332
12. Stephen J. Wayne, Political Parties in the United States, (Mimeo) P-3.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধিকার আন্দোলনে বিরোধীদলের ভূমিকা

৩.১ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন

৩.২ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

৩.৩ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

৩.৪ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন

৩.৫ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

৩.৬ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ঃ আওয়ামী লীগের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ঃ

ভারত উপমহাদেশে সুদীর্ঘ দু'শো বছর বৃটিশ শাসনের পথ পাড়ি দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নাগপাস থেকে মুক্ত হয়ে তৎকালীন বৃটিশ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের এক সুদীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। বস্তুত বৃটিশ ভারতের বিভক্তি এবং পরবর্তীকালে দু'টি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ সুদীর্ঘকালের সংগ্রামেরই অব্যবহিত ফল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই বৃটিশরা ভারতবর্ষে তাদের অবস্থানকে সুসংহত করেন। মুঘল সম্রাট এবং বাংলার নবাব ও সুবেদারদের অত্যধিক উদারনীতির ফলে এদেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতার বিরোধী দু'টি প্রবল শক্তির সৃষ্টি হয়। মূলতঃ এ দুটো শক্তির এক মিলিত ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ যা ইতিহাসে চির অম্লান ও অক্ষয় হয়ে আছে। বস্তুত ঃ নবাব পরিবারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিশ্বাসঘাতকতার কারনেই ইংরেজদের কাছে পরাজিত হতে হয় নবাবদের। তাই সমগ্র বাংলা হয় ইংরেজদের অধীনস্থ এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য হয়ে পড়ে অস্তমিত [১]।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল মূলত এক প্রকার বাণিজ্যিক সংগঠন। ক্রমেই এ সংগঠন স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ও দুর্বল মোঘল সম্রাটদের কাছ থেকে দেশ শাসনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করে কোম্পানি যে ক্ষমতা ভূমিলাভ করে এবং পরবর্তীতে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে এক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তারা আদায় করে নেয় নামসর্বস্ব দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট থেকে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও শোষনের ফলে ভারতবর্ষের জনগনের মনে ক্রমান্বয়ে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে এবং এক পর্যায় তা বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে রূপ নেয়। তারই ফলে ১৮৫৭ সালের সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ ১৮৫৭ সালের এ সশস্ত্র সংগ্রামকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতবাসীর কাছে তা ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। তারা এটাকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত এক গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রাম বা বিপ্লব বলে উল্লেখ করেছেন [২]।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারী সিপাহীরা ব্যারাকপুরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখলের চেষ্টা করে। পর্যায়ক্রমে ভারতের অন্যান্য অংশেও এ বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠে। ইংরেজরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার সাথে এ বিদ্রোহ দমন করে। যুদ্ধে পরাজিত যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দের উপর অত্যাচার চালিয়ে বীভৎসভাবে তাদের হত্যা করা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে বৃটিশ সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সালের প্রণীত আইনের মাধ্যমে সর্ব প্রথম ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। তখন থেকেই বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রত্যক্ষভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুত ঃ এ আইনের মাধ্যমেই উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য এ কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঃ

ইংরেজরা ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটান। মূলতঃ ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণী কর্তৃক তা গ্রহণ করার ফলে জনগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন এবং তারা প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জোরালো দাবি উত্থাপন করতে থাকেন। ভারতীয় জনগণ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী চেতনার প্রভাবে ভাষা, অঞ্চল ও ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতে এক জাতীয় ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। আর এ চেতনা তাদেরকে একটা রাজনৈতিক প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা তাড়িত করে দারুণভাবে।

এক্ষেত্রে প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ মহাজন সভার মাধ্যমে। এ মহাজন সভা স্থানীয় পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বণিক সমিতির সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ সংগঠন নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে পরিষদ সদস্য নির্বাচনের জন্য দাবি জানান। এক্ষেত্রে একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম বিশাল অবদান রাখেন। মিঃ হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের এক আহবান জানিয়ে খোলা চিঠি প্রদান করেন। উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতেই ১৮৮৪ সালের শেষভাগে গঠিত হয় ভারতীয় ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

(Indian Union)। অতঃপর ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় ইউনিয়নের বড়দিনের সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন অংশের ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বোম্বাই শহরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ডিসেম্বর। উক্ত সম্মেলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হয়। এভাবে জন্ম নেয় একটি বিশাল জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা একটি বিশাল রাজনৈতিক প্লাটফর্ম আর তা হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এভাবে কংগ্রেসের জন্মের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানকে দেশীয় জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক রুপায়ন বলে চিহ্নিত করা যায়। এটা ছিল এমন এক জাতীয় সংগঠন যাতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত ছিল । এতদসত্ত্বেও কংগ্রেস মূলতঃ হিন্দু সংগঠনই রয়ে যায়। জন্মলগ্ন থেকে কংগ্রেস ক্রমশ বেড়ে উঠে এবং বৃহদাকার রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এ বিকাশ ধারায় দলটি উদারনৈতিক ভাবধারা থেকে চরমপন্থী ভাবধারার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

কংগ্রেসের একটা বড় দুর্বলতা ছিল যে, এটা ব্যাপকহারে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অধ্যাপক আর, কুপল্যান্ড (R. Coupland) উল্লেখ করেছেন যে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান এবং এ দুজন ছিলেন বোম্বাই'র এক আইনজীবি দম্পতি। দ্বিতীয় অধিবেশনে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা ৩৩ জনে উন্নীত হলেও ক্রমেই তা হ্রাস পেতে থাকে।

স্যার সৈয়দ আহমদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলমান সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান দুটি আলাদা ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। উর্দুর পরিবর্তে বেনারসের হিন্দু নেতারা হিন্দি প্রবর্তনের দাবি তুলে করলে এ ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। সৈয়দ আহম্মদ খান অচিরেই উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান কোনো ব্যাপারে সর্বান্তকরণে একত্রিত হবে না।

বঙ্গভঙ্গ ও তার প্রতিক্রিয়া এবং বঙ্গভঙ্গরদ ঃ

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা পরবর্তীতে রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলা প্রেসিডেন্সীকে বিভক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত দু'টি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ছিল পশ্চিমবাংলা, বিহার ও

Dhaka University Institutional Repository

উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত আর পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয়। যার রাজধানী হয় ঢাকা। 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Devide and Rules) বৃটিশদের এই নীতির ফলশ্রুতী হয়েই মূলতঃ লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সীকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেন।

বাংলা প্রেসিডেন্সীর রাজধানী ছিল কলকাতা। ফলে তা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির মূল কেন্দ্র। হিন্দু জমিদাররা পূর্ববঙ্গ থেকে অর্থ উপার্জন করে কলকাতায় বসবাস করতেন এবং সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। দেখা যায় পূর্ববঙ্গে পাট উৎপাদন হতো প্রচুর। কিন্তু শিল্প কারখানা গড়ে উঠে কলকাতায়। এভাবে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের জনগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের নবাব সলিমুল্লাহর প্রাণের দাবি ছিল এই বড় প্রদেশের বিভক্তি।

নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিনে মুন্সিগঞ্জে এক ভাষণে বলেছিলেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্মসাধনায় এবং সংগ্রামে।" বলা বাহুল্য যে, মুসলমানগণ মনে প্রাণে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ছিল অতীব তীব্র। বিশেষকরে কলকাতার অভিজাত হিন্দুরা বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে অভিহিত করেন 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, পূর্ব বাংলায় ক্রমউন্নতশীল শিক্ষিত ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হিন্দু সমাজের বিকাশ রোধের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই বৃটিশ সরকার পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি করার এ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতী হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন [৩]।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের উদ্যোক্তা লর্ড কার্জনের সমালোচনা শুরু করেন প্রথম থেকেই। বঙ্গবঙ্গের প্রতিবাদে তারা বলেন, বাঙালিরা একটি জাতি এবং এভাবে বাংলাকে বিভক্ত করাটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং অন্যায়। এটা তাদের মাতৃভূমিকে অসম্মান করারই শামিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গভঙ্গের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং একে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর এ কারণেই তারা একে স্বাগত জানায়। বাংলা প্রেসিডেন্সী বিভক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় নতুন নতুন সুরম্য অট্টালিকা, হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন, আইন পরিষদ ভবন, কার্জন হল প্রভৃতি নির্মিত হয়। লর্ড কার্জন স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলারকে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। সঙ্গত কারণেই পূর্ববঙ্গের জনগণ বঙ্গভঙ্গের ফলে অত্যন্ত খুশি হয় এবং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়।

অপরপক্ষে, পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতার অভিজাত হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রী অরবিন্দু ঘোষ, শ্রী বিপিন চন্দ্রপাল, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ নেতা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাকে অহেতুক, অযৌক্তিক ও অপমানকর বলে মন্তব্য করেন। ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অভিযান শুরু হয় এবং অনতিবিলম্বে তা এক দুর্বার আন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলকারীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দ্বিবিধ অস্ত্র ব্যবহার করে। একদিকে তারা বিলেতি দ্রব্য বর্জন তথা স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে এবং অপরদিকে ভয়ভীতি ও হত্যাযজ্ঞের সূত্রপাত ঘটায়। বিলেতি দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে বৃটিশ মিল মালিকদের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন। এর ফলে সমস্ত কল কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং মিল ফ্যাক্টরির অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের জয়গান সৃষ্টি হয় এবং প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের এ বিক্ষোভ ও হত্যাযজ্ঞের মুখে বৃটিশ সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানগণ হতাশ হয়ে পড়েন এবং তারা বৃটিশ সরকারের প্রতি অনেকটা সন্দিহান হয়ে পড়েন। এ ঘটনা থেকে মুসলমানগন শিক্ষা লাভ করে যে, স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে তাদেরকে আরো অধিক সংগঠিত হতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক সংগঠন। আর এ ধারণার প্রেক্ষিতেই 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠিত হয় [৪]।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ঃ

যে তিনটি মূল উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতিই ছিল বৃটিশ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব থেকে কার্যকর। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

এই বিভক্তি শুধু যে মুসলমানদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল তা নয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার এবং সংগঠিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু শ্রেনী এবং কংগ্রেসের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধর্মের ব্যবহার হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় রীতিসিদ্ধ।

স্যার সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যুর পর আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আলীগড় আন্দোলন দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসেন। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের জন্য মর্যাদাকর অবস্থান অর্জনের লক্ষ্যে তারা অটল সংগ্রামে ব্রতী হন। সেই লক্ষ্যে ১৯০১ সালের ২১ ও ২২ অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারিষ্টার সৈয়দ শরফুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে স্যার সৈয়দ আহমদের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী নবাব ভিখার উল মুলক বলেন যে, মুসলমানদেরকে যে কোনো হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া এবং আইন পরিষদে সদস্যপদ লাভ বন্ধ হতে সক্ষম না হতে পারায় তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা রাজনৈতিক সংগঠন একান্ত আবশ্যক।

মুসলমানদের এ উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯০৬ সালের অক্টোবরে আগাখানের নেতৃত্বে উচ্চ শ্রেণীর একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলাতে বড়লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। সিমলা বৈঠকের প্রস্তাব ও বড়লাটের বক্তব্য ভারত ও বৃটেনের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বৈঠকের আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ঢাকায় মিলিত হবেন [৫]।

অবশেষে মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ ঢাকায় মিলিত হন এবং ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' (All Indian Muslim League) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত আন্দোলন ঃ

খিলাফত আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে খিলাফত আন্দোলন এক নব জাগরণ সৃষ্টি করে। এ জাগরণ ছিল মূলত ঃ গণজাগরণ যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশব্যাপী মুসলমান জনসাধারণের অংশ গ্রহণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মুসলমানদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হলে ভারতের মুসলমানগণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। যুদ্ধের পর তুর্কী সমাজ খন্ড খন্ড করে আত্মসাৎ ও খলিফার ক্ষমতা খর্ব করার সাথে সাথে ভারতের মুসলমানরা এক প্রচন্ড বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিদেশী শাসনের বন্ধন ছিন্ন করে মুসলমানদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খিলাফত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৯১৯ সালের শেষার্ধে সর্বজনমান্য মুসলমান জননায়ক মাওলানা মোহাম্মদ আলী এবং মাওলানা শওকত আলী যাঁরা আলী ভাতৃদ্বয় নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে এ খিলাফত আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সাথে মিলিত হয়ে দেশব্যাপী এক দুর্বার বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটায়। এ আন্দোলনই খিলাফত আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ।

১৯১৪ সালে বৃটেন ও জার্মানির মধ্যেকার যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষাবলম্বন করায় মুসলমানদের চেতনার মধ্যে এক নিদারুন টানাপোড়েন শুরু হয়। একদিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের খলিফা হিসেবে তুর্কির সুলতানের প্রতি আনুগত্য এই দ্বন্দ্বে মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের একটি বড় অংশ সুলতানের নেতৃত্বাধীন খিলাফতকে রক্ষার জন্য বৃটিশ বিরোধীতার পথ গ্রহণ করেন। এই বৃটিশ বিরোধীতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলমানদের মধ্যে যে সহযোগিতা গান্ধী এবং মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

প্রথম খিলাফত সম্মেলন ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন সভাপতিত্ব করেন ফজলুল হক এবং গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু, মদনমোহন মালাভিয়া প্রভৃতি সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। ২৪ নভেম্বর খেলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধীজী [৬]। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ শাসনের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে 'খিলাফত কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উল্লেখ করা হয় যে, বৃটিশ শাসকগন অবিলম্বে মুসলিম স্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ না করলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। বৃটিশ জনসাধারণকে তা বুঝাবার জন্য একদল মুসলিম প্রতিনিধি নিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে মোহাম্মদ আলী ইংল্যান্ডে গমন করেন।

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিনিধি দলসহ মোহাম্মদ আলী ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। ইতোমধ্যে 'সেভার্স চুক্তি' (Treaty of Severs) প্রকাশিত হয় যার ফলে সুবৃহৎ অটোম্যান সাম্রাজ্য' ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। তুরস্ক পরিণত হয় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে। মুসলমানগন ভাবতে লাগলেন যে, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার জন্য ২৩ কোটি ভারতীয় হিন্দুর প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে অবিলম্বে খিলাফত ও জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গান্ধীজী ও মাওলানা আজাদ মিলে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি তৈরী করেন [৭]। বস্তুত খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ আন্দোলন শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক পর্যায়ে খিলাফত আন্দোলনের সাথে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হয়ে আন্দোলনের তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধি করে। খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব এখানেই যে, এর মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান জনগণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অভিন্ন মঞ্চ রচনা করতে সক্ষম হন।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ

খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি বৃটিশ ভারতে ১৯২০ সালে যে অপর একটি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তা হলো অসহযোগ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী সারা দেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরাও এ আন্দোলনে যোগদান করে। ১৯২০ সালের ১ জুলাই গান্ধীজী স্বয়ং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে এক চরমপত্র পেশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন করেন মহাত্মা গান্ধী। তার ইঙ্গিতে সমগ্র ভারতবর্ষে আগুন জ্বলে ওঠে । কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান এক বৈপ্লবিক উন্মাদনা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনি বৈপ্লবিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ১৯২০ সালের সেপ্টম্বর মাসের শেষ দিকে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনই গান্ধীজী তার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। অনেক দেশবরেণ্য হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থনে বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত প্রস্তাব পাস হয়ে যায়। অতপর আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় নাগপুর সম্মেলন। এই সম্মেলনে ২২ হাজার প্রতিনিধি নতুন সংগ্রামের উদ্দীপনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে কংগ্রেসের পুরনো মূল উদ্দেশ্যের বদলে নতুন মূল উদ্দেশ্য স্থির করা হয়। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য এখন আর উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন নয়, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভ। নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজী ভারতের আসন্ন গণসংগ্রামের প্রতি দৃষ্টি রেখে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন – "বৃটিশ সরকার জেনে রাখুক যে, তারা যদি তাদের কৃত অবিচারের প্রতিকার না করে তবে বৃটিশ সামাজ্য ধ্বংস করে ফেলাই হবে প্রতিটি ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য [৮]।"

গান্ধীজীর উপরোক্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেদিন ভারতের ত্রিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানদের দাবিই আসলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। জনগণ আর বৃটিশ শাসনকে মেনে চলতে প্রস্তুত নয় এবং বৃটিশ সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটাবার জন্য তারা অধীর হয়ে ওঠে। কাজেই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণাকে তারা চূড়ান্ত সংগ্রামের ইঙ্গিত বলে ধরে নেয়। যাই হোক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।
যথা ঃ

১) বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহার;
২) খেতাব ও পদবী বর্জন, অবৈতনিক পদসমূহ ত্যাগ এবং স্থানীয় পরিষদে সরকার মনোনীত ভারতীয় আসনসমূহ থেকে পদত্যাগ;
৩) সরকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন;
৪) আইনজীবীদের আদালত বর্জন;
৫) রাষ্ট্রচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন;

Dhaka University Institutional Repository

৬) নতুন কাউন্সিলের নির্বাচন বর্জন এবং এসব নির্বাচনে ভোটদানে ভোটারদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;

৭) বিভিন্ন পেশাজীবী জনগণকে মেসোপটেমিয়ায় চাকুরীতে যোগদান না করতে উদ্বুদ্ধ করা;

৮) পঞ্চায়েত গড়ে তোলা এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করা;

৯) চরকার সুতা কাটায় উৎসাহ দান;

১০) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং

১১) সকল প্রকার অস্পৃশ্যতা দূর করা।

স্বল্পকালের মধ্যে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। জনগণের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। গান্ধীজী এবং তাঁর সহযাত্রীগন সমগ্র দেশ সফর করে এ আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করতে শুরু করেন। দেশের ছাত্র সমাজকে তাঁরা আন্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। হাজার হাজার ছাত্র তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। দেশের বহু খ্যাতনামা আইনজীবী আদালত বর্জন শুরু করলেন। আইনজীবীদের অনেকেই রাজনীতিতে নেমে পড়লেন।

হিন্দু নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমান জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে আহবান জানান। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ডঃ আনসারী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। তাঁরা সারা ভারতবর্ষ সফর করে মুসলমানদেরকে এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে বলেন। ফলে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে হাতে হাত ধরে গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

এ আন্দোলনের কারনে অনেককেই কারাবরণ করতে হয়। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলী ভাতৃদ্বয় এবং অপর কয়েকজন মুসলিম নেতা 'রাজদ্রোহ' মূলক অপরাধে গ্রেপ্তার হন। এ সময় ভারতের অনেক শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিডিংকে এক চরমপত্র প্রদান করেন। চরমপত্রে তিনি বৃটিশ সরকারকে সকল কালাকানুন প্রত্যাহার করে ৭ দিনের মধ্যে মনোভাব পরিবর্তনের আহবান জানান, অন্যথায় কর প্রদান বন্ধ করার মতো অপর এক সত্যাগ্রহ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজী প্রদত্ত সময় অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই উত্তর প্রদেশের চেরাচৌরিতে পুলিশ ফাঁড়ির উপর উত্তেজিত জনতার আক্রমনে কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল প্রাণ হারায়। দেশের অন্যান্য স্থানে অনুরূপ গোলাযোগের আশংকা গান্ধীজী তাঁর পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখলেন। ফলে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে। এ সুযোগে বৃটিশ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেফতার করেন। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। ১৮৮৫ সালের পর থেকে শুরু করে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস যতগুলো আন্দোলন করেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন ছিল অসহযোগ আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলনের মাধ্যমেই কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মসূচিতে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। বস্তুত ভারতের রাজনৈতিক জীবন প্রবাহে অসহযোগ আন্দোলন এক লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ভারতবর্ষে যেন এক নবযুগের উন্মেষ ঘটতে যাচ্ছে। আর তার ফলশ্রুতিতেই কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো প্রকার ছোটখাট সংস্কার নয় বরং স্বরাজ অর্জনের ডাক আসে। এবারই সর্বপ্রথম কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পা বাড়ায়।

কংগ্রেস এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে ভারতের জনগণ জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তারা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। দেশের প্রতি ঘরে ঘরে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিতে তারা উন্মুখ হয়ে ওঠে। জনগণ জেল জুলুম উপেক্ষা করে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। স্বরাজ মানুষের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু বলেন, "অসহযোগ আন্দোলনটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে নব প্রাণের সঞ্চার করে।"

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ বা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ বৃটিশ সরকারকে চমকে দেয়। গড়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বার আন্দোলন। এতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরা যোগ দেয়ায় ফলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন রচিত হয়। যদিও পরবর্তীকালে এ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক থামিয়ে দেয়া হয় তথাপি পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অনেক।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাস্তবিক এ আইনকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে গণ্য করা চলে। বস্তুত ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। বলা বাহুল্য এ আইনই পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মূল ভিত্তি রচনা করে। এ দিক থেকে বিচার করলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এখানে এ আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করে।

খ) এ আইন প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে। এর মাধ্যমে প্রদেশগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হয়।

গ) এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে বলে স্থির করা হয়। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রীয়সভা এবং নিম্নকক্ষ ব্যবস্থাপক পরিষদ বলে অভিহিত হবে।

ঘ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রদেশসমূহে যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তা রহিত করে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

ঙ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করার পূর্ণ ক্ষমতা বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতেই ন্যস্ত থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেক্রেটারি অব স্টেট এর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তখনও বিদ্যমান ছিল।

চ) এ আইনে প্রতি রাজ্যে একজন করে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি (Crown Representative) নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

ছ) এ আইনের মাধ্যমে সরকারি বিষয়সমূহকে তিন তালিকায় বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ কেন্দ্রীয় তালিকা (Federal list), প্রাদেশিক তালিকা (Provincial list) এবং যুগ্মতালিকা (Concurrent list)

জ) এ আইনের ফলে বার্মাকে ভারত হতে পৃথক করে এবং ভারতে সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামক দুটো প্রদেশের সৃষ্টি হয়।

ঝ) এ আইনের মাধ্যমে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঞ) এ আইনের ফলে ভারতে সেক্রেটারি অব স্টেটের (Secretary of state for India) কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটে এবং এর স্থলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন, একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়।

ট) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে শাসন বিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত ছিল। তথাপি এ আইন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে । এ আইনের ফেডারেল অংশটুকু ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ কর্তৃক যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে ভারত যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কোনো দিনই কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে গর্ভণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গর্ভণরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের ফলে কেন্দ্র বা প্রদেশ কোনো ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। কিন্তু তা স্বত্বেও বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। বস্তুত এ আইনের বহু ধারা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে গৃহীত হয় [৯]।

ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৩৫ সালের আইন কার্যকর হবে ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিধিটি ছিল এই যে, দেশীয় রাজ্যগুলো যথেষ্ট সংখ্যায় ফেডারেশনে যোগদান না করলে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে না। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বিষয়টি স্থগিত রেখে শুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকারগুলো গঠনের ব্যবস্থাই করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয় ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন।

১৯৩৫ সালের আইন ঘোষিত হওয়ার পর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং প্রায় সকল ভারতীয় দলই তার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন, এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে অকার্যকর বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত সকলেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময়ে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অনেক নীতিগত ও কর্মসূচিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশের কোনো দলের সঙ্গেই জোট গঠন করতে না পারায় তাকে একক্ভাবেই প্রার্থী

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড় করাতে হয়। কংগ্রেস মুসলিম আসনগুলোতে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতে বিশেষ আগ্রহী না থাকায় মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে তারা ৫৮টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জয়লাভ করে ২৬টি আসনে যার মধ্যে ১৯টি আসন ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

কিন্তু মুসলিম আসনে কংগ্রেসের এই দুরবস্থা হলেও সাধারণ আসনে কংগ্রেস এক বিরাট বিজয় অর্জন করে। সেখানে ৮০৮টি হিন্দু আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৭১১টি আসন। পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে কংগ্রেসের কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়নি। পাঞ্জাবে ১৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮টি এবং সিন্ধুতে ৬০টির মধ্যে ৮টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করে। সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস শ্রমিক আসনে ৩৮টির মধ্যে ১৮, ভূস্বামীদের আসনে ৩৭টির মধ্যে ৪, শিল্প-বাণিজ্যের আসনে ৫৩টির মধ্যে ৩টি আসনে জয়ী হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পাঞ্জাবে তারা ৮৬টি আসনের মধ্যে পায় ২টি, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা একটি আসনও পায়নি এবং বাংলায় ১১৯টি আসনের মধ্যে পায় ৪০টি। এছাড়া যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লীগ ৪০টি আসনের মধ্যে জয়লাভ করে ২৭টিতে, বোম্বাইয়ে ২৯ এর মধ্যে ২০টিতে এবং মাদ্রাজে ২৮টির মধ্যে ১১টিতে।

কাজেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের এই ব্যর্থতার কারণে তারা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় এবং সে হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হয়ে পড়ে দুর্বল। অন্যদিকে কংগ্রেস মোট ৪৮২ মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ২৬টি জয়লাভ করে অর্থাৎ ৯৪.৬% আসনে পরাজিত হয়ে কংগ্রেস সারা ভারতের হিন্দু মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার ফলে কংগ্রেস যে শুধু ভারতীয় হিন্দুদেরই একটি রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের এই বক্তব্যই জোরদার হয়।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিধৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখান করে। মুসলিম লীগ দাবি জানায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবস্থার আলোকে ভারতের ভবিষ্যতে সংবিধানের বিষয়টিকে নতুন করে গোড়া থেকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে হবে। কারণ তারা

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি করেন যে, নিখিল ভারতে মুসলমানগণ যদি এক জাতি এবং একই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধ হয় তাহলে তাদের কোনো ভবিষ্যত থাকবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা হবেন সর্বদাই অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। আর তাদের আশা-আকাংখা কখনো বাস্তবায়িত হবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তখনো কোনো প্রস্তাব পেশ করা হয়নি। এমনি এক অবস্থায় ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বসে। এই অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর সভাপতির ভাষণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভাবধারা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথক ধর্মীয় দর্শনের, সামাজিক আচারের এবং সাহিত্যের অধিকারী। তাদের সভ্যতা আলাদা এবং পরস্পর বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। জীবনের প্রতি এবং জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় অনুপ্রেরণা লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস থেকে, একটি সম্প্রদায় সংখ্যালঘু এবং অপরটি সংখ্যাগুরু। কাজেই এ ধরনের দুটো জাতিকে এক জোয়ালে বাঁধলে তা ক্রমান্বয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ডেকে আনবে। জিন্নাহ্ জোর দিয়ে বলেন যে, "যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী মুসলমানরা একটি জাতি। তাই তাদের একটা পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন। প্রয়োজন একটা ভূ-খন্ডের এবং একটা রাষ্ট্রের।" (By any international standard the Muslims are a nation, so they are in need of a seperate homeland, a territory and a state.)

এভাবে মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক আবাসভূমির সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে জিন্নাহ্ বলেন, ভারত বিভক্তির মাধ্যমেই শুধু মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের চিরস্থায়ী আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষকে গভীরতর করেছে। কাজেই ভারত বিভক্তি এবং পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টি চিরকাল হিন্দুদের আধিপত্য থাকার ভয় দূর করবে। দূর করবে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদমিত সংখ্যালঘু হওয়ার ভয়। উপরন্তু ভারত বিভক্ত হলে মুসলমানরা তাদের নিজের মতো করে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিকাশের সুযোগ লাভ করবে। তাদের নিজস্ব প্রতিভা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তারা তাদের জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহ্ তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বপক্ষে সুদৃঢ় ও বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দেন যে, ভারত কখনো ঐক্যবদ্ধ ছিল, এক জাতি ছিল এটা ধারণা করা ঠিক নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের মুসলমানরা একটা পৃথক জাতি। আর দ্বি-জাতি তত্ত্বের এটাই মূল বক্তব্য। এই দ্বি-জাতি তত্ত্বই হলো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল ভিত্তি।

লাহোর প্রস্তাব ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উপমহাদেশের দু'টি জাতি হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের স্বতন্ত্র এবং স্বকীয়তা রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত মিত্রশক্তির নিকট পৃথক আবাসভূমি দাবি করে। বস্তুত মুসলমানগণ সর্বপ্রথম পৃথক আবাসভূমি গঠনের দাবি করে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক অধিবেশন বসে। ২৩ মার্চ এ অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয়। অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার উপর আলোকপাত করা হলো ঃ

Resolved that it is the considered view of this session of All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims, Unless it is designed on the following basic principle, viz, that geographically contigious units are demarcated into regions which should be so constituted with such territory readjustments as many be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

[দ্রষ্টব্য ঃ G. Allana (e.d). Pakistan Movement: Historic Documents.]

এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি বাঙলার কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক কর্তৃক অধিবেশনে পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে মুসলিম লীগের দাবি-দাওয়া সম্বলিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। যথা ঃ

ক) ভৌগলিক দিক থেকে সংলগ্ন, এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করা হবে।

খ) ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বভাগের যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হবে।

গ) এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যসমূহ স্বায়ত্বশাসিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ) দেশের যে কোনো ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূল কথা ছিল ভারতীয় মুসলমানরা ভারতের অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায় নয়, তারা বরং একটি স্বতন্ত্র জাতি। আর সে কারণেই ভারতীয় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার রয়েছে। ১৯৩০ সাল হতে স্যার মুহম্মদ ইকবাল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি এবং স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবি উত্থাপন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে জিন্নাহ্ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করেন। লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকেই পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলন গতিবেগ লাভ করে। সুতরাং এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি। বিশিষ্ট কংগ্রেস মুসলিম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India Wins Freedom গ্রন্থে লিখেছেন যে, "I was surprised and pained when pated in reply said that whether we liked it or not, there were two nations in India [১০]."

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বৃটিশ ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি এবং মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক আবাসভূমির দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ সাংবিধানিক ঘটনা। এ দিক থেকে লাহোর প্রস্তাবকে "পাকিস্তান প্রস্তাব" বললেও অত্যুক্তি হবে না।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ঃ

১৯৪৬ সালের মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের পরিস্থিতি এক মারাত্মক আকার ধারণ করে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার শেষ সম্ভাবনা টুকুও যেন শেষ হয়ে যায়। বৃটিশ সরকারের ফেব্রুয়ারী ঘোষণাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। যে গণপরিষদ বিদ্যমান ছিল তাতে মুসলিম লীগ যোগ দেয়নি। ফলে অবস্থার কোনোরূপ উন্নতির আশা দেখা গেল না। বৃটিশ সরকার বাধ্য হলেন ভারত বিভক্তির অনিবার্যতা স্বীকার করতে। বড়লেস ভাইসরয়ের কাছে বিভক্তির ব্যাপারে সম্মতি জানায়। পন্ডিত নেহেরু ও সরদার প্যাটেল ভারত বিভক্তিতে সম্মত হলেন। গান্ধীজী অবশ্য প্রথম দিকে বিভক্তির পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু অবশেষে তাতে রাজি হন।

এমতাবস্থায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে এক গুরুতর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অবলোকন করেন। কিন্তু এতে তিনি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে এর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিসহ পরিস্থিতি বিবেচনা করেন। তিনি বৃটিশ সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করেন যা ঐতিহাসিক ৩রা জুন (১৯৪৭) পরিকল্পনা নামে অভিহিত। এ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১) বর্তমান গণপরিষদ এর কাজ চালিয়ে যাবে; কিন্তু এ গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র যে সব এলাকায় প্রযোজ্য হবে না সেসব এলাকায় তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে না।

২) যেসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা গণপরিষদে অংশগ্রহণ করবে না তারা নিজেদের জন্য একটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করতে পারবে।

৩) বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদের সদস্যগন স্থির করবেন, তারা ভারতে যোগদান করবেন না পাকিস্তানে যোগদান করবেন।

৪) পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের মুসলমান অধ্যুষিত জেলাসমূহের সদস্যগণ স্থির করবেন তারা ভারত না পাকিস্তানে যোগ দিবে।

৫) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং আসামের সিলেট জিলা হিন্দুস্তানের না পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবে তা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে।

৬) পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের সঠিক সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন (Boundary Commission) গঠন করা হবে।

৭) পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারত স্বাধীনতা বিল নামে একটা বিল বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সিলেট পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো পাকিস্তানের পক্ষে এবং পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো ভারতের পক্ষে রায় দেয়। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো পাকিস্তানের পক্ষে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো ভারতের পক্ষে রায় দেয়। তরা জুনের এ পরিকল্পনাকে কার্যকর করার পদক্ষেপ হিসেবে বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করেন।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ আইনের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটায়। নিচে এ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত ঃ এ আইন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট হতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দু'টি নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, এ আইন উক্ত ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত ঃ এ আইন অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা ও সিলেট জেলার মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা, সিলেট জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল ছাড়া আসাম, দিল্লী, আজমীর, মারওয়ার ও বুর্গ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে।

তৃতীয়ত ঃ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের হাতে নতুন শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত গণপরিষদ দুটো স্ব স্ব দেশের আইন সভারূপেও কাজ করে যাবে। সুতরাং গণপরিষদ্বয়ের কাজ হলো দু'টি দেশের ভবিষ্যতের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্য সম্পাদন।

চতুর্থত ঃ এ আইনের মাধ্যমে উভয় ডোমিনিয়নের জন্য একজন করে গর্ভনর জেনারেল থাকবে এবং ডোমিনিয়ন কেবিনেটের পরামর্শক্রমে ইংল্যান্ডের রানী কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হবেন। তবে তিনি হবেন একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন এবং তাঁর 'ব্যক্তিগত বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি' (Individual Judgement) ও 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' (Discretionery Powers) বিলুপ্ত হবে।

পঞ্চমত ঃ এ আইনের মাধ্যমে ডোমিনিয়নদ্বয় বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার তাদের প্রদান করা হয়।

ষষ্ঠত ঃ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে গভর্ণরদের যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়। এখন হতে তারা হলেন প্রদেশে গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধিমাত্র। তারা কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে বরং নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে পরিগণিত হবে। মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণর মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে স্বীয় কার্য সম্পন্ন করবেন।

সপ্তমত ঃ এ আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের পর হতে ডোমিনিয়ন বা প্রদেশগুলোতে বৃটিশ সরকারের সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। উভয় ডোমিনিয়নই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। উভয় ডোমিনিয়নের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনকে বাতিল করার কোনো ক্ষমতা বৃটিশ সম্রাটের রইল না।

অষ্টমত ঃ এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর বৃটিশ রাজতন্ত্রের সকল প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এর মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং সন্ধি ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট হতে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোকে তাদের ইচ্ছামতো ভারতে বা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

নবমত ঃ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত করে। ভারতে বা পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব আর হোয়াইট হলের উপর না থেকে দিল্লী বা করাচির উপর ন্যস্ত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মহাত্মা গান্ধী দেশ বিভাগ রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই শিষ্য সরদার প্যাটেল এবং পন্ডিত নেহেরু এর বিরোধীতা করেন। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজীর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্তির প্রস্তাবে সম্মত হন। সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উক্ত সালের ১৪ ও ১৫ আগষ্ট কার্যকর বলা হয় এবং সেদিন থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.২ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ঃ

পাকিস্তান আমলে মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দান করার সংগ্রামে এদেশের বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পোনে দু'শো বছর বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর যে পাকিস্তানে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের বাসনা করেছিল বাঙালিরা; কয়েক বছর যেতে না যেতেই ভাষার প্রশ্নে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় বাঙালিদের। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মতো পাকিস্তানও প্রকৃতপক্ষে একটি বহুভাষী রাষ্ট্র ছিল। কেননা চৌদ্দশত মাইলের ব্যবধানে দুই অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙ্গালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধী, পাঠান ও বেলুচ এই পাঁচটি ভাষা-ভাষী জাতিগোষ্ঠী নিয়ে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্টি হলেও পাকিস্তান যে একটি বহুভাষী রাষ্ট্র সে কথা সে দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি গোড়া থেকেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আসছে। বস্তুত পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাস করতেন না। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন,

What we want is not to talk about Bangali, Panjabi, Sindhi, Baluchi, Pathan and so on. They are of course units, but I ask you; have you forgotten the lesson that was taught us thirteen hundred years ago? If I may point out, you are all outsiders here, who were the original inhabitants of Bengal not those who are now living. So what is the use of saying 'We are Bengali or Sindhis or Pathans or Punjabs? No, we are Muslim [১১],

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দানকালে জিন্নাহ্ সে কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan. উক্ত সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছাত্ররা তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে না না ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিশ' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রপাত ঘটে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। উল্লেখ্য, তদানীন্তন পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর আনুপাতিক হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

বাংলা	৫৪.৬%	উর্দু	৬%
পাঞ্জাবি	২৭.১%	সিন্ধী	৪.৮%
পশতু	৬.১%	ইংরেজি	১.৪%

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ঃ

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটা শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং ক্রমিক দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবি বিরোধীতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম হতাশা দেখা দেয় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এই ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় ঃ

১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন একই ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ছাত্র বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং ৩০ জানুয়ারী ঢাকায় পালিত হল ধর্মঘট। সেদিনই গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি;' এবং ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী উক্ত কর্মসূচিকে পন্ড করার জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম কমিটি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিত হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৮০ সালের 'জিজ্ঞাসা'র একুশে সংখ্যলনে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন, এই আন্দোলনের বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা এ ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগায়।

৩.৩ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ঃ

১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদেই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দী অবশ্য এর জন্য নির্বাচনে কারচুপি, বল প্রয়োগ, ভয়-ভীতি প্রদর্শনকে দায়ী করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলায় এর বিপরীতধর্মী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এখানে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কোনোরূপ নির্বাচন দিতে রাজি ছিলেন না। তারা বরং প্রাদেশিক পরিষদের মেয়াদ গণপরিষদের মাধ্যমে বর্ধিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নানা টালবাহানা ও ওজর আপত্তি করে সে নির্বাচনকে অহেতুক বিলম্ব করায়। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার গণদাবীর চাপে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট গঠন ঃ

নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এবং আরো কতিপয় ক্ষুদ্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট যার নামকরণ করা হয় যুক্তফ্রন্ট। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন বিশেষত তাদের অগণতান্ত্রিক ও বিমাতাসুলভ আচরণের জন্য। আর মুসলীম লীগ ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সরকার ও রাষ্ট্রকে একাকার করে ফেলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে রাষ্ট্র বিরোধীতা বলে গণ্য করতেন। তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তারা বাংলার মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ নারাজ। এমনি এক পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত তীব্র চাপের মুখে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। যুক্তফ্রন্টের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। পাকিস্তানি প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবর্গ ২১ দফা সম্বলিত এক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। এই কর্মসূচিই নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গৃহীত হয়। নির্বাচনী ইশতেহারের সুপারিশ রচনা করেন আবুল মনসুর আহমেদ।

নির্বাচনী প্রচার ও ফলাফল ঃ

খুব অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর ন্যায় জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং সভা-সমিতি করে ২১ দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। তাঁরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের কর্মকান্ড ও ব্যর্থতার কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন এবং জনগণকে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করতে আহবান জানান। স্বল্পকালের মধ্যেই পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা আপামর জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচির প্রতি তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে এক

Dhaka University Institutional Repository

অভূতপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নির্বাচনকে ঘিরে এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়। নিম্নে নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করা হলো ঃ

মুসলিম আসন সংখ্যা – ২৩৭	মুসলিম লীগ – ৯ যুক্তফ্রন্ট – ২২৩ নির্দলীয় সদস্য – ৪ খেলাফত রব্বানী পার্টি– ১
অমুসলিম আসন সংখ্যা – ৭২	কংগ্রেস – ২৪ তফসিলী ফেডারেশন – ২৭ যুক্তফ্রন্ট – ১৩ খ্রিষ্টান – ১ বৌদ্ধ – ২ কমিউষ্ট পার্টি – ৪ নির্দলীয় – ১

উপরের বর্ণিত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অবশিষ্ট ৫টি আসনের মধ্যে ৪টি লাভ করেন নির্দলীয় সদস্যগণ এবং ১টি লাভ করেন খেলাফত রব্বানী পার্টি। অপরদিকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে ২৪টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিষ্টান ১টি, বৌদ্ধ ২টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি এবং নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় সাফল্য সূচিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে প্রায় সাত বছর যাবত মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার উপর যে নির্মম শাসন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বলিষ্ঠ এক প্রতিবাদ। এ নির্বাচন এটাও প্রমাণ করে যে, পূর্ববাংলার পক্ষে কথা বলা বা তাদেরকে শাসন করার কোনো অধিকার আর মুসলিম লীগের নেই।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে অনেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম বলে মনে করেন। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত 'Histrory of Bengal' গ্রন্থে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়, 'However the election result had no decissive important on the nature and direction of

Dhaka University Institutional Repository

subsequent political changes including the emergence of Bangladesh.' [১২] এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং এও প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

৩.৪ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বৈষম্য ও দীর্ঘ শোষণ নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফা ভিত্তিক এক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

স্বায়ত্বশাসনের পটভূমিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা ছিল বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে চরম অবহেলা, বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে আরো জোরদার করে তোলে। ১০ জানুয়ারী, ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি ঘোষণার পর যখন পাকিস্তানি শাসক চক্রের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় তখনই ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্সের সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিব ৬ দফা পেশ করেন। কিন্তু জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবের উত্থাপিত ৬ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এসব দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন। [১৩] নিম্নে ৬ দফা [১৪] কর্মসূচির বর্ণনা দেওয়া হলো:

প্রথম দফা :

Dhaka University Institutional Repository

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ প্রথম দফায় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বভৌম আইন পরিষদ ছিল প্রথম দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় দফা :

কেন্দ্রীয় সরকারের তাৎপর্যঃ দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তৃতীয় দফা :

মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা ঃ

(ক) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।

(খ) দুই অঞ্চলে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আলাদা মুদ্রা থাকবে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চতুর্থ দফা :

রাজস্ব, কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা ঃ সকল প্রকার কর ধার্য ও কর আদায়ের ক্ষমতা থাকবে ফেডারেশনভূক্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আপনা হতেই আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন তহবিলে জমা হয়ে যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর এ মর্মে বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে।

পঞ্চম দফা :

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা ঃ এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়।

ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) প্রাদেশিক সরকার নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের এখতিয়ারে রাখবে।

গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সমানভাবে বা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) দেশে উৎপাদিত পন্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে।

ঙ) বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানির অধিকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা :

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনে ক্ষমতা ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি প্যারা মিলিশিয়া কিংবা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের সুপারিশ করেন যাতে করে পূর্ববাংলা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সামরিক একাডেমি ও এখানে নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপনের প্রস্তাব দেন।

ছয় দফা আন্দোলন :

ছয় দফার প্রস্তাবগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত আগেকার দাবিগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালে আবুল কাসেম ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি এবং ১৯৫৭ সালে কাগমারি সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি 'আসসালামু আলাইকুমের' সিঁড়ি বেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬ দফা বাঁচার দাবি প্রস্তাবে প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি করলেন। [১৫]

৬ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে শেখ মুজিব অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদকে বলেছিলেন, "আসলে এটা ৬ দফা নয়, এক দফাই ঘুরিয়ে বললাম শুধু" [১৬] ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিল, শেখ মুজিব ৬ দফা দাবিতে সেই মনোভাবকেই একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। এখানেই তাঁর নতুনত্ব। বাংলাদেশের মানুষ ৬ দফার মধ্যে নিজেদের মনোভাবের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তারা ৬ দফাকে তাদের মুক্তিসনদ হিসেবে মনে করে এবং ক্রমান্বয়ে এ দাবি গণদাবিতে রূপ লাভ করে।

ছয় দফার মূল বক্তব্য ছিল পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাদে আর সব বিষয়ে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন। শেখ মুজিব ৬ দফার মধ্যে দেশের দু অঞ্চলের মধ্যে আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক বৈষম্য ও জাতিগত রাজনৈতিক বিরোধীতাকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। এমন এক সময় ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, যখন বাঙালিরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্বের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল এবং শোষনের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রফেসর ডঃ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেছেন, "Six point demand came at a very opportune moment when there existed political vacuam in the country and the people of the East Pakistan were looking for a Formula to put forward their demand for survival." (১৭)

ছয় দফা কর্মসূচি প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলায় বিরাট সাড়া পড়ে যায়। পূর্ববঙ্গের জনগণ ব্যাপকভাবে এ কর্মসূচি সমর্থন করে। এ গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতে প্রাধান্য লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন হিসেব ৬ দফা নিম্নধ্যবিত্ত, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, সাধারণ বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থন অর্জন করে। ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠতে দেখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের প্রধান প্রধান নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। এমতাবস্তায় আওয়ামী লীগের সফল নেতা, কর্মী, সক্রিয় সমর্থকদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবুও আন্দোলনের ধারা থেমে থাকেনি।

৬ দফা আন্দোলনের জন্যে যে নৈতিক মনোবল ও সাহসের প্রয়োজন ছিল শেখ মুজিবুর রহমান সেই সাহস ও শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে ৬ দফা আন্দোলনের সূচনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "আমার অবর্তমানে আপনারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এমনও হতে পারে আমার আওয়ামী লীগের কোনো নেতাই হয়তো বাইরে থাকবে না। তবে কোনো অবস্থাতেই ৬ দফার আন্দোলন থেকে সরে আসবে না। কেননা এ আন্দোলনের নিজস্ব একটি গতি আছে।" (১৮)

৬ দফা ভিত্তিতে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ালেন। দিনের পর দিন তিনি অক্লান্তভাবে বহু জনসভার অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তি সনদ হিসেবে ঘোষণা করে জনগণকে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগ এককভাবে ৬ দফার দাবিতে হরতাল আহ্বান করে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিন আওয়ামী লীগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। কৃষক-শ্রমিক,ছাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙালির স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। আইয়ুব খানের স্বৈরচারী শাসনের ভীতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর গুলিতে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে মনুমিয়া, মুজিবুল হক ও কয়েকজন শ্রমিকসহ অনেক লোককে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল। (১৯) ৭ জুনের রক্তস্নাত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৬ দফার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রমানিত হয়।

আইয়ুব খান ৬ দফাকে রাষ্ট্রের সংহতির পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। তিনি ৬ দফা কর্মসূচিকে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন, বাস্তবায়নের এবটি পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি দেশকে দু'অংশে বিভক্ত করার ফর্মুলা' (২০)। মুসলিম লীগ এ কর্মসূচিকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। (২১) চারদিকে বিতর্ক ও রাজনৈতিক যুক্তির ঝড় বয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছয় দফার সংগ্রাম শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের আবশ্যিক পটভূমি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণ যে মুহূর্তে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন ৬ দফা কর্মসূচি। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং ধীরে ধীরে জাতিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। মূলত ছয় দফা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ। ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাময় এক প্রেরণা।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ৬ দফা সম্বলিত স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হওয়ার কারণে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা এ দেশবাসীর নিকট ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের দাবিকেই স্বাধীনতার এক দফার দাবিতে রূপান্তির করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বস্তুত ৬ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম রচিত হয় এবং বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামক এক নবীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনামলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এমন এক নিপীড়নমূলক মামলা যার বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের পথে অন্যতম এক অধ্যায় যার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে জনতার সংগ্রামের ফলে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এক অনন্য স্থান দখল করে আছে।

৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন যখন জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে, তখনই নেমে আসে শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্যাতন। শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় বাঙালিদের তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার দেবে না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই শেখ মুজিব স্বাধীনতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল তা দূর করার জন্য ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশী আলী রেজা এবং ভারতীয় Inter-Intelligence Department এর বিগ্রেডিয়ার মেনন অংশ নেন। কিন্তু চূড়ান্ত সময় আসার পূর্বেই এ পরিকল্পনার খবর আইয়ুব প্রশাসনে জানাজানি হয়ে যায়। ফলে ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয় । এ মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকার্য শুরু হওয়ার পর থেকে এর প্রতিবেদনের বিবরণ দৈনিক পত্রিকাসমূহে ফলাও করে প্রচার হতে থাকে। বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আইয়ুব সরকার কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর বাঙালি মাত্রই কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে জাতি হিসেবে চিরদিন পদানত করে রাখতে চায়। এদিকে শেখ মুজিব ও ৬ দফাপন্থী অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সাল থেকে বন্দি অবস্থায় কারাগারে থাকলে, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বভার সচেতন ছাত্র সমাজের উপর বর্তায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া গ্রুপ), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব বিরোধী 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। সকল রাজবন্দির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা তুলে নেওয়ার ঘোষণাসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। বস্তুত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ পাঁচ মাস সময় পূর্ববাংলায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে।

পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয় দফাপন্থী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), নিজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (মমতাজ, দৌলতানা), ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নবাবজাদা নূরুল্লাহ খান)- এ আটটি রাজনৈতিক দল মিলে আট দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে। আট দফা দাবির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন আন্দোলনে প্রাধান্য ছিল মূলত ছাত্র সমাজের। কিন্তু অন্যান্য গোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী সকলেই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। ইতোমধ্যে মাওলানা ভাসানীর আহ্বানে দেশে হরতাল পালিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, শ্রমিক এবং সাংবাদিকগণ হরতাল পালনে অংশ গ্রহণ করেন।

এ দিকে ১১ দফার দাবিতে ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারী থেকে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এদিকে পুলিশি নির্যাতনও চলতে থাকে পুরো মাত্রায়। ২০ জানুয়ারী ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিন। এর আগেই আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ২০ জানুয়ারী ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের জুলুম-নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। পূর্ববাংলার আপামর জনগন ১৪৪ ধারা লংঘন, কার্ফু ভঙ্গ, পুলিশ, ইপিআর, সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে [২২]।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। চতুর্দিক ধ্বনিত হতে থাকে গগন বিদারী শ্লোগান। ক্রমান্বয়ে এ ছাত্র আন্দোলন এবার্ট গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এ গণবিক্ষোভ দমনে শাসকগোষ্ঠী সেনাবাহিনী তলব করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে গুলি চালিয়েও জনগণের এ দুর্বার আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়নি [২৩]।

অবশেষে একনায়ক আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারীতে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। তিনি ঢাকার নেতৃবৃন্দের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও বন্দী। এদিকে মাওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে গণআন্দোলন আরো তীব্রতর হয়।

এদিকে ২০ জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) এর মৃত্যু, ২৪ জানুয়ারী পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনষ্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমানের মৃত্যু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারী বন্দী অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়। জনতা ঐদিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে, মামলার প্রধান বিচারকসহ কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়ি, গাড়ি ও জনস্বার্থ বিরোধী পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে, সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ সংবাদ সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন আরো তীব্রভাবে জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন [২৪]। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারী এক গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ কর্তৃক কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হলে শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন পূর্ববাংলায়। ফলে গণআন্দোলনের জোয়ার আরো তীব্র হয়। ২০ মার্চ আইয়ুব খানের তাবেদার গভর্নর মোনায়েম খান অপসারিত হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ড শুরু হয়। আইন ও শাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শরনাপন্ন হন। ২৫ মার্চ তিনি সকল ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এভাবে আইয়ুব-মোনায়েম চক্র পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে অপসারিত হন।

৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার ভাসিয়ে দেয় চারিদিক। আইয়ুব খানের স্বপ্নসাধ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে। সারা পাকিস্তানব্যাপী অভ্যুত্থান আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভীতকে নাড়িয়ে দেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। গণঅভ্যুত্থানের ফলেই সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। আর এ নির্বাচনই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

৩.৬ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ : আওয়ামী লীগের ভূমিকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর ষড়যন্ত্র :

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো ও ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রক্রিয়া হিসেবে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার প্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুসারে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ২টি আসন ছাড়া বাকি যে কটি আসনে অংশগ্রহণ করেছিল তার সবগুলোই জয় লাভ করে (৭টি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মহিলা আসন বাদ দিয়ে)। এভাবে আওয়ামী লীগ প্রায় ৭২% ভোট লাভ করে জাতীয় পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ যে দুটি আসন হারায় তার একটি পি.ডি.পি'র প্রধান নূরুল আমীন এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় লাভ করেন। আওয়ামী লীগ অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর দল পি.পি.পি. জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৩টি আসন লাভ করে এবং ৫টি মহিলা আসন ছিল পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। এতে করে পি.পি.পি জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিনত হয়। এ দলটিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো আসন লাভ করেনি। অন্যান্য জাতীয় দলগুলো খুব একটা সুবিধা করতে হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৯টি আসন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ ২টি, ন্যাপ (ওয়ালী) ৬টি, পি.ডি.পি ১টি জামায়াত-ই-ইসলাম ৪টি, জামায়াতে উলামায়ে পাকিস্তান (হাজারভী) ৭টি, মারকাবী জামায়াত-ই-ওলেমায়ে ইসলাম ৭টি এবং স্বতন্ত্র ১৪টি আসন লাভ করে।

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। তার মধ্যে ২০টি আসন ছিল পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা আসন। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পি.পি.পি. পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাঞ্জাবে পি.পি.পি. ১৮০টি আসনের মধ্যে ১১৩টি আসন লাভ করে এবং সিন্ধু প্রদেশে ৬০টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসন লাভ করে। এভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোনো রকম বিশৃংখলা ও ঝামেলা ব্যতীত এবং নির্বাচনের পর সারাদেশে স্বস্তি ফিরে আসে। জনগণ নতুন আশা ও উদ্দীপনায় বুক বাঁধে।

বস্তুত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরাট সাফল্য ক্ষমতাসীন ইয়াহিয়া সরকারের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয়। ইয়াহিয়া সরকার আশা করেছিলেন যে, নির্বাচনে হয় পি.পি.পি নতুবা দক্ষিনপন্থী ইসলামিক দলসমূহ জয়লাভ করবে অথবা নির্বাচন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার বিপরীত এবং নির্বাচনী ফলাফল পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে আঘাত হানে।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ ষড়যন্ত্র চলে। অথচ নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয় পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগ ও পি.পি.পি'র মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর এ কাজে ভূট্টো সাহায্য করলেন জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল হিসেবে আসন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। ভুট্টো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় একক্ভাবে দেখতে চাননি বরং এক ধরনের কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এমনকি তিনি এও বলেন যে, আওয়ামী লীগ ও পি.পি.পি. তাদের স্ব স্ব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কাজেই উভয়েরই সরকার গঠনে অংশ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এদিকে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবৃন্দ ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে অটল রইলেন। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা দেশের ভবিষ্যত সংবিধানের খসড়া তৈরীর কাজে সময় ব্যয় করতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারী শেখ মুজিব দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে রচিত হবে। এক্ষেত্রে তিনি কোনো মৌলিক বিষয়ের সাথে সমঝোতা না করে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতার সাহায্য ও সমর্থন চাইলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "There was no scope of readjustment in his party's Six- Point Programme because it was on the basis of this programme that the referendum was held in the country. And as such the Six-Point Demands were no more his party's properties, it belonged to the people. [২৫]"

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা ঃ

নির্বাচনোত্তর সরকার গঠন প্রশ্নে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তা নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য। ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দুই দফা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিব বলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, শেখ মুজিবের সাথে তাঁর আলোচনা সফল হয়েছে। শেখ মুজিবই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে সাক্ষাত করেন এবং ভুট্টোকে শেখ মুজিবের সাথে ঢাকায় গিয়ে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে অনুরোধ জানান। ১৯৭১ সালের ২১ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ১৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানান। আওয়ামী লীগের পক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে গণতন্ত্র ও বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমে সংবিধান ও পরে সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট এ কথায় কর্ণপাত না করে অনেকটা নিশ্চুপ থাকেন।

এদিকে প্রেসিডেন্টের অনুরোধে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ভুট্টো ঢাকা এলেন ২৭ জানুয়ারী। ঢাকায় এসে তিনি ঘোষণা করেন যে, দু'পক্ষের একটা সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি এসেছেন। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারী দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য আলোচনার ফলাফল থাকে অপ্রকাশিত। ফিরে যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, "আলোচনা আরো চলতে পারে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়।" ফিরে যাবার সময় তিনি এ ধারনা দিয়ে গেলেন যে, তার পূর্ববর্তী ধারনায় নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব তার ছয় দফায় কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করবেন তা মোটেও ঠিক নয় [২৬]। যাইহোক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সঠিক তারিখ নির্ধারন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৩ ফেব্রুয়ারীঘোষণা দেন যে, ৩ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আওয়ামী লীগসহ প্রায় সকল দলই এ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়।

কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় পি.পি.পি'র নেতা ভুট্টোকে নিয়ে, ১৩ ফেব্রুয়ারী তিনি পেশোয়ারে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার প্রেক্ষিতে হুমকি দিয়ে বলেন যে, আওয়ামী লীগ ছয় দফার প্রশ্নে আপোষ না করলে তাঁর দল ৩ মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। তিনি এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের সাথে আরো আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কিন্তু ভারতের বিমান হাইজ্যাকিং এর ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থা মোটেও উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের অনুকূল ছিল না। ফলে মুজিব এবং ভুট্টো উভয়ের পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারীভুট্টো ঘোষণা করেন যে, 'I can put myself in jeopardy, but it is a question of 83 of my party leaders going to East Pakistan under the prevailing state of affairs. I can not permit them to be double hostage. [২৭]"

ভুট্টোর এ ঘোষণায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রচন্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান বলেন, ভুট্টোর এ সিদ্ধান্তের ফলে জনমনে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রচন্ড সন্দেহ দেখা দেয়। তিনি ও তাঁর দল জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এক অনানুষ্ঠানিক সভায় শেখ মুজিব বলেন, 'We have done our job; Let him (Bhutto) do his

Dhaka University Institutional Repository

own; এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান, মাওলানা মওদুদী প্রমুখ।

২৮ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্টের জরুরী আমন্ত্রণে ভুট্টো করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি যান। যাবার প্রাক্কালে তিনি একদলীয় কর্মী সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, দেশে তিনটি শক্তি বিদ্যমান- আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনী। প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা শেষে ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সংবিধান রচনার ব্যাপারে তাঁর দলের সদস্যদের ভূমিকা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে বলে ভুট্টো মনে করেন [২৮]।

অতপর ২৮ ফেব্রুয়ারী ভুট্টোর কাছ থেকে আসে সর্বশেষ বিবৃতি। বিবৃতিতে তিনি দুটি বিকল্প পন্থার কথা বলেন ঃ (ক) জতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের তারিখ বাতিল করতে হবে এবং (খ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ১২০ দিনের সময়সীমা তুলে নিতে হবে। এ দাবি দুটো মেনে নিলে তিনি যথাশীঘ্র ঢাকা যাবেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য। তিনি আরো বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যদি ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনটি প্রধান Political Actor পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রিয়াশীল ছিল। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের মতামত ছিল ভিন্ন। ফলে তাদের মাঝে মতৈক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা দুরুহ হয়ে পড়ে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাঃ

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও আইয়ুব খানের অনুরূপ কাজ করেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তিনি যেন এমনি একটা পরিস্থিতি কামনা করেছিলেন এবং তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেন। এ ব্যাপারে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সাথে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনবোধ করলেন না। প্রেসিডেন্ট অবশ্য তাঁর এ সিদ্ধান্তের পেছনে দুটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপলস পার্টি এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটা রাজনৈতিক দলের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে অস্থিরতা সৃষ্টি। প্রেসিডেন্ট অবশ্য বলেন যে, দেশে যে মুহূর্তে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবে তখনই তিনি কাল বিলম্ব না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন।

এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। তারা ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করেন। জনগণ স্বাধীন বাংলার দাবিতে শ্লোগান দিয়ে মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। জনগণের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে শেখ মুজিব ২ মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তান হরতাল পালনের ডাক দেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'The Assembly session has been postponed to assuage the sentiment of the minority and the Bangalees will not tolerate this silently.' [২১]

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে যখন এমন বিস্ফোরণ উন্মুখ অবস্থা তখন ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ শেখ মুজিব ও ভুট্টোসহ আরো ১২ জন নেতাকে আমন্ত্রণ জানান এক বৈঠকে যোগদান করার জন্য। এ বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ভুট্টো উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কিন্তু শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু লোক হতাহত হবার প্রতিবাদে শেখ মুজিব মূলতঃ তা প্রত্যাখান করেন। তিনি সরকারকে এসব নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন। এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদসহ আরো অনেক নেতা আওয়ামী লীগ আহুত অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন করেন।

ইয়াহিয়া সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র ঃ

পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানে যখন চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজমান তখন ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান কতিপয় নেতৃবৃন্দসহ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল এ আলোচনাই যেন সংকট থেকে পরিত্রান লাভের সর্বশেষ প্রকাশ্য প্রচেষ্টা। একমাত্র এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমেই পাকিস্তানটা রক্ষা করা যেতে পারে। এ ঘটনা দেশের সর্বত্র অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ভাবনার পর শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনায় বসবেন বলে স্থির করেন। ১৬ মার্চ (১৯৭১) মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হয়। ১৯ মার্চ ঢাকায় অদূরে জয়দেবপুরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে ই.পি.আর এর একটি দলকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করলে এক মারাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণও তাতে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে পাক বাহিনীর গুলিতে ২০ জন নিহিত ও ১৬ জন আহত হয়। সরকারি হিসেবে নিহত ও আহতের সংখ্যা অবশ্য অনেক কম দেখানো হয়। এমন এক অবস্থায় মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যে তৃতীয় দফা বৈঠক বসে ১৯ মার্চ।

অবশেষে ২২ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে ৭৫ মিনিটব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটাই ছিল সর্বপ্রথম তিনজনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। আলোচনা শেষে শেখ মুজিব বলেন, দেশে এখনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত ক্রমে ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট। ভুট্টো বলেন যে, তিনি আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে আশাবাদী [৩০]। ২৩ মার্চ পুনরায় প্রেসিডেন্ট টিমের সাথে আওয়ামী লীগ টিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগ টিমের পক্ষ থেকে একটি খসড়া ঘোষণা পেশ করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রদানের পক্ষ সমর্থন করে। প্রেসিডেন্ট টিম এ খসড়া ঘোষণার উপর আলোচনা এবং এর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু তারা এর সাথে একমত হতে পারলেন না [৩১]।

যাইহোক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল ভিন্ন এক অধ্যায়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের জন্য এদিন ছিল কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বলা হয় যে, লেঃ জেনারেল পীরজাদা ২৫ মার্চ বিকেলে তাঁদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত অধিবেশনে যোগদান করা জন্য খবর দেবেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস সে খবর আর আসেনি বরং সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে বন্দরটি চলে যান। যাবার প্রাক্কালে তিনি লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে গিয়েছিলেন। আর সেই নির্দেশ মোতাবেক ২৫ মার্চ রাতে শুরু হয় এক বর্বরোচিত গণহত্যা। ইয়াহিয়া খানের এ সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সংকট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক সমাধানে না গিয়ে সামরিক সমাধান অনুমোদন করেন। ফলে অনির্বাযভাবে শুরু হয় মুক্তি সংগ্রাম তথা বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব নগর সরকার ও যুদ্ধের চূড়ান্তরূপ ঃ

২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্ব বাংলায় যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তা মোকাবিলা করা ও জনগণকে দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য গঠন করা হয় অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এ অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। আর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন জেনারেল ওসমানী।

এর পূর্বেই ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেতারের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা ছড়িয়ে পড়লে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। বস্তুত রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। স্বাধিকারের জন্য মরিয়া বাঙালি তখন থেকেই মুক্তি সংগ্রামে আত্মদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৬ মার্চের ঘোষণা বাংলার জনগণকে যুদ্ধের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে অসীম সাহস যোগায়।

তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন। এটি করা হয় মূলতঃ যুদ্ধে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য। বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের হাজার হাজার নারী-শিশু তথা বেসামরিক লোকজন দলিত হতে থাকে পাকিস্তানিদের নির্যাতনে, শুরু হয় নৃশংস গণহত্যা।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে পেরে উঠবে না বাঙালিরা। তাই তারা বেছে নেয় গেরিলা যুদ্ধ। এদিকে অস্থায়ী সরকারের সচিবালয় স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। প্রবাসী সরকার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশেষতঃ ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের বিজয় দুরূহ ব্যাপার। ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এদিকে লাখ লাখ শরনার্থী পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেয়। তাদেরকে পরম সহযোগিতা প্রদান করে ভারত সরকার। বস্তুত প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রাম চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের রমরমা অবস্থা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) আরো তীব্রতা লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্রী চীনও কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দারুনভাবে ত্বরান্বিত করে।

গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদাররা পর্যদুস্ত হবার প্রাক্কালে ঘটে যুগান্তকারী আক্রমন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। যৌথ বাহিনীর আক্রমনে পাষন্ড হানাদাররা পিছু হটতে শুরু করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা হানাদার মুক্ত হতে থাকে এবং বিজয় কেতন উড়তে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। রচিত হয় বাঙালির রক্তমাখা বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে একটা নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দলটির নেতা তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক এক করে প্রত্যেক ধাপ অতিক্রম করে বহুকালের লালিত স্বপ্ন, স্বাধিকার অর্জিত হয়। ৩০ লাখ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে যে দেশের জন্ম, বঙ্গবন্ধু সে দেশের মানুষের স্বপ্ন, দেখাতে শিখিয়েছিলেন বিভিন্ন আপোষহীন আন্দোলনে, ভাষণে ও বক্তৃতায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান শুধু একজন আপোষহীন নেতা হিসেবেই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হিসেবে বাঙালিদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩

২. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (ঐতিহ্য-ঢাকা) পৃষ্ঠা-২৬

৩. ভারতের জাতীয়বাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা-১১১

৪. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (ঐতিহ্য-ঢাকা) পৃষ্ঠা-৭৮

৫. M. Rahman, From Constitution to confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics, 1906-1912, PP-8-9

৬. বদরুদ্দীন উমর, জাতীয় আন্দোলন, (ঐহিত্য-ঢাকা) পৃষ্ঠা-৭৭

৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা-২৬৭

৮. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৯

৯. ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৭

১০. Moulana Abul Kalam Azad, India wins Freedom, Page-194

১১. এম.আর আখতার মুকুল, একুশের দলিল, পৃষ্ঠা-১৫

১২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, History of Bengal, পৃষ্ঠা-৪৯৩

১৩. ড. মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৪২।

১৪. শেখ মুজিবর রহমান, আমাদের বাঁচার দাবী ছয় দফা কর্মসূচি, পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৬। আরো দেখুন ছয়দফা, নরুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, ১৯৬৬,পৃষ্ঠা- ১-৮; শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

১৫. সিরাজ উদ্দীন আহম্মেদ, বাংলাদেশ গড়লো যারা, ভাস্কর প্রকাশনী, শান্তিনগর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪০।

১৬. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৪৬

১৭. Dr. M.A Wadud Bhuiyan, Emergence of Bangladesh and the Role of Awarni League, Vikash Publishing House, New Delhi, 1982, Page-100.

১৮. আবু আল সাঈদ, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭৮

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮জুন, ১৯৬৬

২০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র (ত্রয়োদশ খন্ড) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৬৬১

২১. Pakistan Observer, Feb. 15, 1966

Dhaka University Institutional Repository

২২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯

২৩. Pakistan Observer, Jan. 21, 1969

২৪. The Pakistan Times, (Lahore) February 10-15, 1969.

২৫. Pakistan Observer, Dhaka, January 4, 1971.

২৬. The Pakistan Times, (Lahore) January 29, 1971.

২৭. দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ এবং The Dawn, February 16, 1971

২৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

২৯. দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ২, ১৯৭১

৩০. The Dawn, Karachi, March 23, 1971

৩১. White Paper on the crisis of East Pakistan Islamabad: Government of Pakistan Press, August, 1971, PP 19-26.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিরোধীদলের ভূমিকা

৪.১ আওয়ামী লীগের শাসন ও ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তন

৪.২ জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

৪.৩ স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে বিরোধীদলের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ আওয়ামী লীগের শাসন ও ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তন

'সংসদীয় গণতন্ত্র' ও 'বাঙালির আন্দোলন' কথা দুটি একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের জনগণকে এই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, করতে হয়েছে অনেক আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগষ্ট বৃটিশ শাসনের অবসান হলে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানও সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্র দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চারজন গভর্ণরের অধীনে ৭টি মন্ত্রীপরিষদ ছিল। সংসদীয় সরকারের নীতিগুলো বাস্তবে কাজ করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রথমবারের মতো সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ইহা বেশি দিন টেকেনি।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই দশ বছর সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকে। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের একমাত্র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ পূর্ববাংলার সকল রাজনৈতিক দল সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো দাবি তোলে ও তা পরবর্তীতে কার্যকরী হয়। এভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থা বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়, যেখানে সরকারি দল ও বিরোধী দলের অংশ গ্রহন অতীব জরুরী।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেমন দেখা যায়, স্বাধীনতা আন্দলনের পর নেতৃত্বদানকারী দল শাসনকারী দল হিসেবে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের মাঝে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দলটি সুশৃঙ্খলভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশের জনগণের কাছে শাসক হিসেবে ততটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা অর্জিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান প্রণয়নঃ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ কারাভোগের পর যখন তিনি স্বদেশে ফিরে আসলেন, তখন দেশে লাল সবুজের পতাকা পত পত করে উড়ছে। স্বাধীন দেশের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে উঠার জন্য শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন।

সে আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ এর নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হন। আর ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। তারপর ১৯ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করেন এবং ১০ জুনের সভায় তা চূড়ান্ত করেন। তারপর ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে এবং সেদিনই ড. কামাল হোসেন খসড়া শাসনতন্ত্রটি অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। তারপর এর উপর আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ৪ নভেম্বর খসড়াটি পরিষদে গৃহীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়।

অধ্যাপক রওনক জাহান লিখেছেন, "The constitution of Bangladesh is an interesting document since it is an attempt to facilitate political development in Bangladesh according to the Indian model. The constitution incorporates a number of provisions it an eye to ensure the stability of the system." (১)

ভারতীয় মডেল অনুসারে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। যথা- সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy), সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialist Economy), একটি একক কর্তৃত্ব সম্পন্ন দল (Single Dominat Party) এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শ (Secular Ideology)। অনেকটা একই ধারণা অনুসরন করে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে- গণতন্ত্র (Democracy),

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্র (Socialism), ধর্ম নিরপেক্ষতা (Secularism), এবং জাতীয়তাবাদ (Nationalism)।

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে পরিচিত হবে। সংবিধানে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ বৃটেনের ন্যায় একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবে এবং সকল সরকারি ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবে। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। জাতীয় সংসদ হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ৩০০ গণপ্রতিনিধির সমন্বয়ে এ সংসদ গঠিত হবে। তাছাড়া মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের প্রকৃত প্রধান নির্বাহী হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন নামমাত্র শাসক।

চতুর্থ সংশোধনী; ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫

কাঠামোগতভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। ফলেই একে সংসদের সাধারণ আইন প্রণয়নের মতো সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না। এর পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদের আইন দ্বারা সংবিধানের যে কোনো বিধান সংশোধিত বা রহিত করা যাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে চার বার সংবিধানের সংশোধনী হয়েছে। এর মধ্যে সাংবিধানিক ইতিহাসে ৪র্থ সংশোধনী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ সংশোধনী বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে।

জাতীয় সংসদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে। এ সংশোধনী সংবিধানের এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এ পরিবর্তন ছিল পদ্ধতিগত পরিবর্তন যার ফলে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির কথা বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি একজন উপ-রাষ্ট্রপতি, একজন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন। এ সংশোধনীর ফলে সকল দলের সমন্বয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের বিধান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের উপর যুক্তিসঙ্গত হস্তক্ষেপ করার বিধানও এ সংশোধনীতে স্থান পায়। তাছাড়া এতে জেলা গভর্নরের বিধান করা হয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এসব রাষ্ট্র পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিহার করে, হয় একদলীয় ব্যবস্থা নতুবা সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে [২]।

বাকশাল গঠন ঃ

চতুর্থ সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য দেশে একটিমাত্র দল থাকার বিধান করতে পারবেন। এ দলটি জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। জাতীয় দল গঠন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সমূহ সংবিধানের ষষ্ঠ (ক) অংশের ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল সংক্রান্ত আদেশ জারি করবেন এবং এ আদেশ জারি হবার সাথে সাথে দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটবে। এ দলের নামকরণ, সদস্যভূক্তি, সংগঠন, শৃংখলা, অর্থসংস্থান, কর্তব্য ও দায়িত্ব সংক্রান্ত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতি আদেশবলে নির্ধারিণ করবেন।

চতুর্থ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির আদেশ সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এভাবে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ প্রদান করে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। সংশোধনীতে আরো বলা হয় যে, যখন জাতীয় দল গঠিত হবে তখন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যদের জাতীয় দলের সদস্য হতে হবে।

কোনো সংসদ সদস্য যদি জাতীয় দলের সদস্য না হন তাহলে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যপদ হারাবেন এমনকি তিনি রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাও হারাবেন। সংশোধনীর ১১৭ক (৫) ধারায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় দল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অপর কোনো দল গঠন বা এর সদস্যপদ লাভ কিংবা অপর কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। এ দলটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল (BAKSAL)।

বাকশালের প্রধান হবেন রাষ্ট্রপতি নিজে। দলটির সংগঠনের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত থাকবে। আওয়ামী লীগের সব কমিটিই এখন থেকে বাকশালের কমিটি বলে পরিগণিত হবে। শেখ মুজিবর রহমান এ এক দলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলেন যে, জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল বলা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালবাসে, এর আদর্শ বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এ দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছে থেকে পয়সা নেয় এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এ দলের সদস্য হতে পারবেন। কারণ তাঁরাও এ জাতির একটা অংশ। এ জন্য সকলে যে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

জাতীয় দলের শাখা বা ব্রাঞ্চ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এ জাতীয় দলের আপতত পাঁচটা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা, যুবকদের একটা এবং মহিলাদের একটা, এ পাঁচটি অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেকে বলে, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ হলে আমাদের কি হবে। আমি বলি, আওয়ামী লীগ মানে তো জনগণ, ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ [৪]।

১৯৭৫ এর পটপরিবর্তন ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। এ দিন দেশে সেনাবাহিনীর ২০-৩০ জন তরুন অফিসারের নেতৃত্বে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর ১৪০০ সৈন্যের সমর্থনে দেশে এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। লেঃ কর্নেল ফারুক, লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ, মেজর ডালিম, মেজর নূর প্রমুখ এতে নেতৃত্ব দেন। এতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এর পর আওয়ামী লীগ নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের মন্ত্রীসভার ১৮ জন মন্ত্রীর ১০ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর ৮ জনই নতুন মন্ত্রীসভায় স্থান পায়। মোশতাক সরকার একদলীয় শাসন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বিষয়সমূহ বাতিল ঘোষণা করেন। পূর্ববর্তী সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য এবং উর্ধ্বতন অফিসারদের আটক রাখা হয়। মোশতাক আহমদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৭৬ সালের ১৫ আগষ্ট রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদান এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন দেয়া হবে। তিনি জেনারেল সফিউল্লাহর পরিবর্তে জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রধান করেন।

এমতাবস্থায় একই বছরে ৩ নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটে, যাকে মুজিববাদী মস্কোপন্থীরা ব্যাপকভাবে সমর্থন জানায়। অভ্যুত্থানের পর খালেদ মোশাররফ জিয়াকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ ও বন্দী করেন। এরই মধ্যে জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যা করা হয়। ৫ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ খন্দকার মোশতাক আহমদকে বিচারপতি সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেন। কিন্তু কর্ণেল তাহের ও জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর পরিকল্পনা মাফিক ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনীতে পাল্টা অভ্যুত্থান সূচিত হয়। এ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফসহ সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যা করে জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা হয় এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় [৫]।

বস্তুত আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এবং সুসংগঠিত দল হওয়া সত্ত্বেও ইহা দেশের মানুষকে যে আশারবাণী শুনিয়েছিল শাসনকারী দল হিসেবে তা পূরণ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি সফল হয়নি।

"Power which was means to an end with the nationalist elite before independence. The elite rejected parliamentary democracy and turned to an alternative model which promised it to a longer stay in power'[৬].

আওয়ামী লীগ সরকার দেশে বিদ্যমান অসন্তুষ্টির কারণসমূহ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। জনগণ বাকশালের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি দেশের জনগণের বীতশ্রদ্ধভাব আসে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াঃ

সামরিক শাসন ঃ ১৯৭৫ সালে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য সামরিক শাসকদের ন্যায় ক্ষমতায় এসে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মূলতঃ একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন, আর যে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে তা নিতান্তই অন্তর্বর্তীকালীন, নিরপেক্ষ এবং অরাজনৈতিক। এর উদ্দেশ্য হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে সামরিক সরকার দুটো বিশেষ নীতি গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ সামরিক সরকার যদিও প্রথম থেকেই নিজেদেরকে রাজনীতি নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেন তবুও তারা দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে বাকশাল বিরোধী করে তুলতে সচেষ্ট হন। সরকারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্ররোচনায় বামপন্থী ও ডানপন্থী শক্তিগুলো নিজেদেরকে বাকশালীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে তোলে। সরকারী প্রচার যন্ত্র এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বল্পকালের মধ্যেই সারা দেশে একটা বাকশাল বিরোধী ও রুশ-ভারত বিরোধী জনমত গড়ে উঠতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ সামরিক সরকার ব্যাপকভাবে সীমান্ত চাপ প্রতিরোধ, ফারাক্কা সমস্যার সমাধান, শহরের রাস্তা-ঘাট সংস্কার এবং গ্রামে-গঞ্জে স্বনির্ভর আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এগুলো ছিল তখন জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলোকে কেন্দ্র করে তাই সামরিক সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাকশাল বিরোধীদের নিকট আস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের গোড়া থেকেই সরকার মুজিব শাসনামলে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জরুরী ক্ষমতা বিধি অনুসারে আটকৃত ব্যক্তিদেরকে মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহের পুনর্বিবেচনা শুরু করেন।

১৯৭৬ সালে মার্চ মাস থেকে সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিমান বাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল এম.জি, তওয়াব, নৌ-বাহিনী প্রধান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল মোশারফ হোসেন সভা-সমিতি করে সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। এমনি সময়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। একটি হলো জিয়াউর রহমানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ার ভাইস মার্শাল

Dhaka University Institutional Repository

তওয়াবকে কাপূর্বক ক্ষমতা থেকে অপসারণ; অপরটি হলো ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদন্ড প্রদান। এভাবে জিয়াউর রহমান একদিকে চরম ডান অপরদিকে চরম বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তখন থেকে তিনি মধ্যপন্থীদের আস্থা অর্জনে ব্রতী হন।

১৯৭৭ সালে ২১ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক উভয়পদই অলংকৃত করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি সংবিধানের মূলনীতির ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন।

১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করে যথাক্রমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচারের সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

এছাড়া ১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ সামরিক সরকারের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, 'বাঙালী' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে এবং এখন থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের 'বাংলাদেশী' বলে উল্লেখ করা হবে। এভাবে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনটি মূলনীতিতেই পরিবর্তন সাধন করা হয়; কেবলমাত্র গনতন্ত্রকে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ঃ

উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলসমূহের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সব সামরিক শাসকই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, তাদের ক্ষমতা নিতান্তই একটা অস্থায়ী ব্যাপার এবং অতিশীঘ্রই তারা ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে তার বিপরীত। খুব কম সামরিক শাসকই তাদের ক্ষমতা রাজনৈতিক এলিটদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা লাভের পরই তারা উক্ত ক্ষমতাকে কিভাবে পাকাপোক্ত করে নেয়া যায় সে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ কিভাবে করা যায় সেদিকে তারা

Dhaka University Institutional Repository

মনোনিবেশ করেন। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন জারির পর সামরিক শাসকবৃন্দ তাদের শাসনকে বৈধকরণ এর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমতা বৈধকরনের চেষ্টা করেন। প্রথমটি নির্বাচন ও দ্বিতীয়টি দল গঠন।

- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭৭;
- পৌরসভা নির্বাচন, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭;
- গণভোট অনুষ্ঠান, ৩০ শে মে, ১৯৭৭;
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৩রা জুন, ১৯৭৮;
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯;
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন , ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন তাঁর সামরিক শাসনামলকে বৈধ করার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে জাতি গঠনমূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন ঠিক তখনই ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে তিনি নিহত হন। তাঁর এ মৃত্যু ছিল অভাবনীয় ও অস্বাভাবিক। রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারাদেশে এক শোকের ছায়া নেমে আসে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। সে মুহূর্তে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে বিরোধীদলের ভূমিকাঃ

"Following Zia, Ershad did the same job. Like many other dictators in the world he did not allow anybody who could succeed him. He held the Office of the president while his wife was the first lady. He was the chairman of Jatiya Party; head of the state and government and chief of the armed forces the bastion of power" (৭)

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ তৎকালে বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্তুত এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এবক্য এবং জোটবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই গণতন্ত্র পূণরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করে যে, "আমার চরম ও পরম লক্ষ্য হলো দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।" ঐ বছরের শেষার্ধেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও যোগাযোগ শুরু হয়। তারা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে থাকে। এদিকে ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী সামরিক আইন লঙ্ঘন করে আন্দোলন শুরু হলে সরকার কঠোর হতে দমন করে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এ সবের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। ১টি জোট গঠিত ১৫টি দলকে নিয়ে এবং আরেকটি জোট গঠিত হয় ৭টি দলকে নিয়ে। ১৫ দলের নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ আর ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দেয় বি, এন, পি।

দুই জোট সাধারণভাবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ ৫ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো ছিল একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, সামরিক আইনের অবসান ইত্যাদি। এ দুই জোটের সাথে যোগ দেয় আরো কিছু দল। দুটি জোট আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে। আন্দোলনের চাপে এরশাদ সরকার ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া এবং নভেম্বর মাস থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে। নভেম্বর মাসে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হলে বিরোধী দল ও জোটসমূহ ১৯৮৩ সালের

Dhaka University Institutional Repository

২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দেয়। ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের অবস্থানকে কেন্দ্র করে দেশ চরম সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। তখন সরকার রাজনৈতিক তৎপরতা আবার নিষিদ্ধ করে দেয়। এ পর্যায়ে ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৫ দল ও ৭ দল এ সরকারি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবি করে। বিরোধী জোটের আন্দোলনের ফলে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। এরপর সরকার পরিকল্পনা নেয় যে, রাষ্ট্রপতি ও সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে। বিরোধী জোট দু'টি সরকারের এ পরিকল্পনাও প্রত্যাখান করে। কারণ তারা জাতীয় সংসদের নির্বাচন দাবি করে। সরকার ঘোষণা করে যে বিরোধী দলের দাবি অনুসারে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। কিন্তু বিরোধী জোটগুলো সরকারের নির্বাচনের এ পরিকল্পনাও বাতিল করে দেয়।

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ঐ সময় বিরোধী জোটের কিছু শর্ত মেনে নেন এবং ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও বিরোধী জোটসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হলো না। শুরু করল জোর আন্দোলন। ফলে জেনারেল এরশাদ ১ মার্চ সামরিক আইনের বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে পুনঃআরোপ করেন। ঐ বছরে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট এবং ১৬ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এরশাদ তাঁর নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার গণরায় লাভ করেন। মে মাসে দেশে প্রথমবারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যেই যরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয় এবং ১ জানুয়ারী থেকে দেশে অবাধ রাজনীতি চালু হয়। দশমাস পরে আবার অবাধ রাজনীতি চালু হবার সাথে সাথেই রাজনৈতিক আসর গরম হয়ে উঠে এবং অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে নির্বাচনই প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। সামরিক আইনের অবসান ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দুই বিরোধী জোট ও জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন তীব্রতর করার উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সভা, মিছিল, হরতাল ও সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পথ বেছে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষাপটেই সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এবারও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা না দিলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহন করবে না। এরশাদ ঘোষণা করলেন যে যদি বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তবে তিনটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এগুলো হলোঃ মন্ত্রীসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দপ্তর বিলুপ্ত করা হবে এবং সামরিক আদালতসমূহ তুলে নেয়া হবে। কিন্তু ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রপতির ভাষণকে প্রত্যাখান করে। তারা প্রস্তাবিত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা ২৬ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করারও সংকল্প প্রকাশ করে। ৮ মার্চ দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ ২২ মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে।

কিন্তু ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ জেনারেল এরশাদ হঠাৎ করে জাতির সামনে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, বিরোধী দলগুলো রাতারাতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত না নিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বিরোধী দলের কয়েকটি শর্তও মেনে নেয়ার কথা বলেন। এ ভাষণের পরপরই ঐ রাতেই ১৫ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, তারা এরশাদের নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ৭ দলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। ১৫ দলীয় জোটের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। ১৫ দলীয় জোট থেকে নির্বাচনে ৮ দলীয় জোট অংশ নেয়। বৃহৎ দল আওয়ামীলীগ ছাড়া অন্য দলগুলো হলো ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ), ন্যাপ (মোজাঃ), সিপিবি, ওয়ার্কাস পার্টি (নজরুল), সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) এবং গণ আজাদী লীগ এবং যারা বিপক্ষে ছিল তারা হলো জাসদ (ইনু), ওয়ার্কাস পার্টি (মেনন) প্রভৃতি। তাছাড়া আরো যে সকল দল নির্বাচনের বিপক্ষে আন্দোলন করেছিল তারা হলো বিএনপি, খন্দকার মোস্তাকের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, আলি আহাদের নেতৃত্বে ৬ দলীয় জোট এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোট দল।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের পর জুলাই মাসে জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু ঐ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি। অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রস্তুতি চলতে থাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের। জেনারেল এরশাদ চিফ অব স্টাফ এর পদ থেকে পদত্যাগ করলে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ১৫ অক্টোবর। প্রধান বিরোধী জোটসমূহ এ নির্বাচনেও অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তথাপিও নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৭ম সংশোধনী পাসের মাধ্যমে ১১ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও বিরোধী দল ও জোটগুলো এতে সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ তাদের প্রকৃত কোন দাবিই পুরণ হয়নি। সংসদের ৩য় অধিবেশন ডাকা হয় ২৪ জানুয়ারী, ১৯৮৭ । ঠিক এর এক সপ্তাহ আগে ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ১৫ দফা দাবি ঘোষণা করে যার মধ্যে অন্যতম ছিল সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন। সংসদের বাইরে ঐ দুই জোট দাবি দিবস পালন করে আর সংসদের ভিতরে ৮ দলীয় আওয়ামী জোটের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ শুরু হবার সাথে সাথে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। কিন্তু এ ধরনের মিল থাকা সত্ত্বেও বিরোধী জোটগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারছিল না।

১৯৮৭ সালের ২৯ মার্চে ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি বিরোধী জোটের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। ১৯৮৭ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৭ সালের ১৭ জুন ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তথা এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে অনেকটা অভিন্ন মত পোষণ করেন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের ডাকে ২ দিন অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই এরশাদ সরকার 'জেলা পরিষদ' বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত করলে এবং মাত্র ৪ মিনিটে তা পাস হয়ে গেলে জাতীয় সংসদের বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ, সিপিবি, ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ) এবং ওয়ার্কার্স সদস্যরা পার্টির জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। জেলা পরিষদ বিলের বিরুদ্ধে ১৩ জুলাই ৭ দল, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা শহরে হরতাল পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের ১৮ জুলাই ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে এক দফা দাবিতে অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সকল জোট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে সংকল্প বদ্ধ হয়। তিন জোটের ডাকে ২২ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ৫৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। এ হরতাল পালনের সময় কয়েকজন নিহত ও আহত হলে ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুলাই রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে ৫ জন পুলিশসহ প্রায় ৩০ ব্যক্তি আহত হয় এবং সমগ্র দেশের জনগণ সরকারের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়। এ ক্রমবর্ধমান গণরোষের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১ আগষ্ট জেলা পরিষদ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোট ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস ধরে তিন জোটের সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এক বৈঠকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সফল করে তোলা এবং আসন্ন ১০ নভেম্বরে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। এর ফলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ অবরোধ কর্মসূচি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ৮ নভেম্বর এরশাদ সরকার ঢাকা শহরে ৭ দিনের জন্য ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। "The Al and BNP could not meet on the same platform. They fought separately for a common target the custing general election and election under the caretaker government." ৯ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া আবারও বৈঠকে বসেন এবং এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এরশাদ সরকার রাজধানীমুখী সকল ট্রেন, বাস, লঞ্চ, নৌযান ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেন। কিন্তু জনগণ সরকারের শত বিরোধিতা ও বাঁধাকে উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটেই ঢাকা শহরে আসতে শুরু করেন। ১০ নভেম্বর সমগ্র ঢাকা শহর বিশেষ করে জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করে গুলিস্থান পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় একদিকে জাতীয় পার্টির সমর্থক ও পুলিশ বাহিনী, অপরদিকে জনগণের মধ্যকার সংঘাত রনক্ষেত্রে পরিনত হয়। বহু পুলিশ ও জনতা হতাহত হয়। এরশাদ সরকার ১২ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অন্তরীন করেন। এর ফলে প্রায় সমগ্র নভেম্বর মাস ধরেই এরশাদ সরকার বিরোধী হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষ প্রশমনের জন্য ২৭ নভেম্বর রাতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩১ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী দলগুলোকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু বিরোধী তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আলোচনা বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে। ৩ ডিসেম্বর জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৮ ডিসেম্বর রাতে সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং ১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীন অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এরশাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। ১৯৮৮ সালে ৮ দলীয়, ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভা-সমাবেশ আয়োজন করতে থাকে। ২৪ জানুয়ারী চট্টগ্রামের এরূপ একটি সমাবেশে শেখ হাসিনা বক্তব্য প্রদান করতে উপস্থিত হলে জাতীয় পার্টির কর্মীগণ ও সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। এ নরকীয় হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে।

১৯৮৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে বিভিন্ন স্থানে যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয় তাতে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ ও পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন করে। জনগণ এ সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধী জোট ও দলসমূহও এ নির্বাচন বর্জন করে। তবে এ নির্বাচনে আ,স,ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে 'একাত্তর দলীয় সম্মিলিত জোট' (বকপ), ফ্রিডম পার্টি, ২৭ দলীয় ইসলামী জোট, ২৩ দলীয় জোট, জাসদ (সিরাজ), জনদল, বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করেন। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রহসনমূলক। প্রায় সকল জনগণই এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে রাজধানীতে ৭ জন নিহত ও প্রায় তিন শতাধিক লোক আহত হয়। ১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংবিধানের 'অষ্টম সংশোধনী বিল' উত্থাপিত হয়। ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিরোধী জোট ও দলগুলো অষ্টম সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংশোধনী উত্তর বাংলাদেশের রাজধানীতে পূর্বের ন্যায় সরকারি ও বিরোধী শিবিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ছাপ পাওয়া যায়। ৫ দলীয় ঐক্যজোট স্বৈরাচার উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, কৃষক, ক্ষেতমজুর, তাঁতীসহ গ্রামীণ মানুষের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৯৮৯ সালের ২৯ জুলাই সকল উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ২১ আগষ্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে। কিন্তু ইতোমধ্যে ২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের পূর্ববর্তী ৮ম সংশোধনী আংশিকভাবে বাতিল ঘোষিত হলে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বিরোধী দলগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থার ফলেই মূলতঃ এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর বিশাল সমাবেশ থেকে বিএনপি ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়ে এর পূর্বেই সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান। ৭ দলীয় জোটের কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলিম লীগ, জাগপা এবং ৬ দলীয় জোট। এর পাশাপাশি ২৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এদিকে বিএনপি'র ১৯৮৯ সালের ২৮ নভেম্বর কর্মসূচিতে সরকারি বাঁধাদানের ফলে সকল বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবেশ থেকেই ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ৩৬ ঘন্টার হরতাল আহবান করেন। সে সাথে জামায়াতে ইসলামী, ৫ দল, ৬ দল, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য জোট ও দলসমূহ হরতাল পালনের আহবান জানায়। ঢাকা মহানগর ফ্রীডম পার্টিও ২৯ ও ৩০ নভেম্বর হরতালের ডাক দেয়। এভাবে প্রায় সকল বিরোধী দলই হরতাল আহবান করায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ২৯ ও ৩০ নভেম্বরের দেশব্যাপী হরতাল সফল হয়। সরকারের বিভিন্নমুখী হরতাল বিরোধী প্রচারণা সফল হয়নি; তবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ নয় বছর এরশাদ দেশে যন্ত্রত্ববাদী নীতি অনুসারে দেশ শাসন করেন। অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চর্চা করার কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মধ্যে এরশাদ বিরোধী মনোভাব জন্ম লাভ করে। ১৯৮৭-৮৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ৮ দলীয়, ৭ দলীয় এবং ৫ দলীয় জোট এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯৯০ সালের শুরুতে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৫ দল, ৬ দল ও অন্যান্য কয়েকটি জোট একইরূপ কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ৮ দলীয় জোট ৭ দফা দাবি আদায়ের প্রস্তাব ঘোষণা করে। ৭ দলীয় জোট ২৪ জানুয়ারী গনঅভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করেন।

সামনে আসে উপজেলা ও ডাকসু নির্বাচন। উপজেলা ও ডাকসু নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন বিনির্মাণে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ঐ সম্ভাবনা পরিস্কার হয়ে উঠে এরশাদ সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট বিরোধী আন্দোলনে। সরকার ১৪ জুন যে নতুন বাজেট পাস করে তার বিরুদ্ধে জনগনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিরোধী জোটগুলো এ প্রথমবারের মত একটি ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিরোধী ৩ জোট বাজেট বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৮ জুন দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

১৯ নভেম্বর তিন জোটের কাছে আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে নতুন রূপ দান করে।

"On November 1990, the three alliances issued a joint statement, the declaration stated that Ershad would be forced to appoint (under article 51 of the constitution) a new vice president acceptable to the three alliances and that Ershad himself must resign and hand over power to the vice president could act as the acting president. The acting president would then form a neutral government to hold free and fair election".

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা সাধারণ জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। বিরোধী দলগুলো ১৯৯০ সালের ২০ নভেম্বর সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ছাত্রঐক্যের আন্দোলন চরম আকার ধারন করে। ২৭ নভেম্বর বিএমএ'র যুগ্ম-মহাসচিব ডাঃ সামসুল আলম মিলনের মৃত্যুর পর দেশের সমস্ত চিকিৎসকরা অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ রাতেই এরশাদ সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ২৯ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৩০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট আন্দোলনের যৌথ নির্দেশনাবলী ঘোষণা করে। ১

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলেই কর্মবিরতি ঘোষণা দেন। এভাবে সকল পেশার মানুষ এরশাদের পদত্যাগের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠে।

গণঅভ্যুত্থানের চাপে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুসারে বিরোধী দলগুলো সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান করেন। ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন। ১২ ডিসেম্বর এরশাদ ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে গুলশানের একটি গৃহে অন্তরীন করে। ১৭ ডিসেম্বর এরশাদের দুর্নীতি তদন্তে একটি কমিশন গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ২ মার্চে (পরে তা সংশোধিত করে ২৭ ফেব্রুয়ারী করা হয়) সংসদ নির্বাচনের তারিখে ঘোষণা করেন। ঐ সময় থেকেই বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কেন্দ্রিক জোর তৎপরতা শুরু করেন। অনেকের মতে ১৯৭১ সালে প্রথম বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় বিপ্লব, ৭০ দশকের শেষ পর্যায়ে ইরানে এবং ৮০ দশকের মাঝামাঝি ফিলিপাইনের পর বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ঘটনা ঘটেছে [৮]।

"Ershad thus had no alternative but to hand over power to the chief justice of the Supreme court, Justice Sahabuddin Ahmed (a consensus candidate of all political parties) on December 6, 1990, Justice Ahmed was given a mandat by all opposition parties to hold free and fair elections of the Jatiyo Sangsad, within 3 months of his assuming office. Thus the civil society prevailed over the armed sector of the state." [৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. Bangladesh in 1972; Nation Building in a New State, Asian Survey, February-1973

২. The Fate of Human Rights in the Third world Politics, Vol. xxvii, January, 1975, P-203.

৩. Bangladesh : Constitutional Experimentation in the Aftermath of Liberation প্রকাশিত হয়েছে Bangladesh Politics: Problems and Issues, UPL, Dhaka, 1980.

৪. ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিব কর্তৃক প্রদত্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা সংক্রান্ত ভাষণ।

৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৫

৬. K. Ali, Bangladesh A New Nation

৭. Parliamentary Democracy in Bangladesh, From crisis to crisis, Jaglul Haider, J. Asiat Soc Bangladesh, Hum, Vol, 42, No. 1, June-1997.

৮. অধ্যাপক এ.কে.এম. শহিদুল্লাহ, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন, ১৯৯১। সম্পাদনা: অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মেদ। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, ১৯৯২ পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৯. Talukder Monirzzaman, Politics and Society of Bangladesh, UPL 1994, P-173

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৯১-৯৬ সময়কালে সরকারী দলের কার্যক্রম ও বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা

৫.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু

৫.২ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারী দল ও বিরোধীদলের মধ্যে মতপার্থক্যের সূচনা

৫.৩ মিরপুর ও মাগুরা উপ-নির্বাচন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলন

৫.৪ ১৫ ফেব্রুয়ারীর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলন এবং বহু প্রত্যাশিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু:

এরশাদ সরকারের পতনের ক্রান্তিলগ্নে, প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলোর সম্মিলিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯০ দিনের মধ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। অবশেষে সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব ঐ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণানুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মডেল হিসাবে দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রশংসা অর্জন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন অনেক। নির্বাচনের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৭৭৪ জন। ভোটার সংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় কোটির উপর, তবে ভোটদান করে ৩,৩০,৮৮,৫৬০ জন। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের (মহিলা সদস্যসহ জাতীয় সংসদের মোট আসন ৩৩০টি) এর মধ্যে ২৯৮টি আসনে (প্রার্থী মৃত্যুর কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত তারিখে। এ নির্বাচনে ৫২.৩৭ ভাগ ভোটদাতা ভোট দান করেন। একাধিক আসনে জয়ী প্রার্থীদের ছেড়ে দেওয়া এবং মৃত্যুর কারণে শূণ্য হওয়া ১১টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৬৯টি আসন (মহিলা আসনসহ) লাভ করে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে। আওয়ামীলীগ ৮৮টি আসন লাভ করে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯১ সালের ৯ মার্চ ৪টি আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩ টিতে এবং বিএনপি ১ টিতে জয় লাভ করে। ১১ মার্চ, ১৯৯১ জামায়াতের এক প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনপিকে সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেন। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নদলের প্রাপ্ত আসন দেখানো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪১	২৮	১৬৯
আওয়ামী লীগ	৮৮	-	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	-	৩৫
জামায়াতে ইসলামী	১৮	২	২০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৫	-	৫
বাকশাল	৪	-	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	১	-	১
গণতন্ত্রী পার্টি	১	-	১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	-	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১	-	১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাঃ)	১	-	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	১	-	১
স্বতন্ত্র	৩	-	৩
সর্বমোট	৩০০	৩০	৩৩০

পরবর্তীতে 'বাকশাল' নামক দলটি আওয়ামী লীগে যোগদান করায় আওয়ামী লীগের সদস্য হয় ৯২ জন।

465969

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। আর সে কারণেই এর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ বিএনপি'র সরকার গঠনের দাবিকে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ দাবি করেন যে, বিএনপি'র সংসদীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরই কেবল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন। এদিকে বিএনপি সংসদীয় সরকারের প্রশ্নে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনা ঘোষণা করেন যে, বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় বিএনপির সরকার গঠনের কোন অধিকার নেই। বিএনপি সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করবে বলে হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলগুলো জরুরী ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সম্মত হন। ঐদিনই রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণা দেন। তিনি বিএনপি'র সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে ১১ জনকে মন্ত্রী ও ২১ জনকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রী পরিষদ গঠনের বৈঠকে বিরোধী দলের কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহবান করেন। নির্ধারিত তারিখে সংসদে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন তিনি অতিশীঘ্র রাষ্ট্রপতি দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম অধিবেশনে বিএনপি'র সাংসদ আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পীকার পদে এবং শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হন। সংসদের প্রথম অধিবেশন প্রায় ৪২ দিন স্থায়ী হয়। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকেই সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ দেয়।

১১ জুন থেকে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ঐ অধিবেশনের শুরুতেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়ার অনুরোধ জানান। ২০ জুন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ঈদের পর ২৯ জুন সংসদে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য বিল পেশ করা হবে। সংসদীয় পদ্ধতি চালু হলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে অব্যাহতি পাবেন। ২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উপস্থাপন করেন। ঐ দিন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ রাষ্ট্রপতির পূর্বপদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত একাদশ সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন। ২ দিন পর ৪ জুলাই বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিল উপস্থাপন করা হয়। উভয়দলের প্রস্তাবে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকায় সমঝোতার ভিত্তিতে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ জুলাই বাছাই কমিটি বিলটি সংসদে পেশ করে। সমঝোতার মাধ্যমে বাছাই কমিটি বিলটি উপস্থাপন করলেও ঐ বিল পাসের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ একই সাথে আওয়ামী লীগ ইনডেমনিটি আইনটি

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনের দাবি জানায়। অবশেষে সকল রকম বাঁধা, সংশয়, দ্বিধা ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে ৬ আগষ্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। জাতীয় সংসদে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সাড়ে ১৬ বছর পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পূণ:প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পূর্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান সম্বলিত একাদশ সংশোধনী বিলটিও পাস হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিলে ৩০৭ জন উপস্থিত সংসদ সদস্যের মধ্যে সবাই একমত হয়ে ভোট দেন। একাদশ সংশোধনী বিলে জাতীয় পার্টি ও এনডিপি ভোটদান থেকে বিরত থাকে। এ দু'টি বিল পাসের মধ্য দিয়ে পঞ্চম সংসদের প্রথম সফলতার বীজ বপন করা হয়। "The passage of the 12th constitutional amendment bill was the culmination of protracted and painstaking movement for restoration of democracy."

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ফলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ৮ অক্টোবর ঘোষণা করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ। বিএনপি'র পক্ষ থেকে আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে মনোনয়ন দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেয় সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ১৭২-৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মোট ২৬৪ জন সংসদ সদস্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর পূর্বপদ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বাদশ সংশোধনী বিলে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ (ক) ধারার কোন কোন বিধান সংশোধন হয়েছে বলে এ ব্যাপারে সাংবিধানিক গণভোটের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ সংশোধনী বিলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেবেন কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে ৭ দিনের মধ্যে গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনকে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সারাদেশে গণভোটের দিন ধার্য হয়। এই গণভোটে হ্যাঁ সূচক ভোট পড়ে শতকরা ৮৪.৪২ ভাগ এবং 'না' সূচক ভোট পড়ে শতকরা ১৫.৫৮ ভাগ। সমগ্র দেশে হ্যাঁ ভোট পড়ে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪২

Dhaka University Institutional Repository

হাজার ৮৮২টি এবং না ভোট পড়ে ৩৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১৫টি। ভোট বাতিল হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৮টি। ১৮ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিলে সম্মতি প্রদান করেন। সংসদীয় সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯ সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।

মাঝখানে অক্টোবর মাস থেকে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন দুর্ভিক্ষ সম্ক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলোর খবর সত্য নয়। ২৩ অক্টোবর জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য প্রদানকালে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন।

২১ জুলাই, ১৯৯১ সালে বি.এন.পি সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম হরতাল পালিত হয়েছিল। বিএনপি সরকার উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের উদ্যোগ নিলে এরশাদ আমলে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানরা এই হরতালের ডাক দেয়। ৬ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পতন দিবসে আওয়ামী লীগের সমাবেশে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ৮ ডিসেম্বর ৮ ঘন্টা হরতাল ডাকা হয়। পরদিন ৯ ডিসেম্বর উপজেলা চেয়ারম্যানরা ঢাকা ছাড়া সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯১ সালে এই তিনদিন হরতাল পালিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। পাটকল শ্রমিকরা ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টা অবরোধের ডাক দেয়। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের প্রধান হিসেবে গোলাম আজমের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। উল্লেখ্য গোলাম আজম তখন পর্যন্ত পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে বহাল ছিলেন।

ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের একটি চিঠি লিখে পাঠান যাতে তিনি দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের হস্ত ক্ষেপ কামনা করেন। উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, "বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসাবে আমি উন্নয়নের সহযোগী ও দাতা সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট কিছু গুরুতর ঘটনা অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় কর্মীরা বিভিন্ন সমাবেশে হামলার শিকার হচ্ছেন এবং তাদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন"।

সরকার এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এ জাতীয় কর্মকান্ডে যারা লিপ্ত তারা ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সহযোগী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কণ্ঠরোধ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের হুমকির মুখে সম্ভাব্য নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দলীয় কর্মী ও ছাত্রলীগ সদস্যরা নানা ধরনের ভয়ভীতির শিকার হচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এমনকি তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও সরকার দলীয় কর্মীদের হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বাংলাদেশে এখন এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ সকল ঘটনা এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রতি গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেছে। আমি আমার দলীয় কর্মীদের উপর হামলার কয়েকটি ঘটনা এতদ্‌সঙ্গে উল্লেখ করছি। দেশে গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা বর্তমান সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলে আমরা খুশী হব।

শেখ হাসিনার এ চিঠির প্রতিলিপি ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯১ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। তারপর থেকেই দেশব্যাপী নিন্দা আর সমালোচনার ঝড় শুরু হয়। দীর্ঘদিন চলে পক্ষ-বিপক্ষের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি।

১৯৯১ এর নির্বাচন তথা পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সংসদীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় গণতন্ত্রের অনুশীলন। আরো প্রয়োজন ছিল সরকার ও বিরোধীদলকে সেই অনুশীলনের শর্ত হিসেবে সুস্থ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রথম দিকে বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ঐকমত্য ভিত্তিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে এ রকম একটি সুন্দর সম্পর্কই সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণের আশা আকাঙ্খা ছিল এ ধরনের ঐক্যমত্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের জন্য "ছায়া সরকার" বা 'ছায়া কেবিনেট' গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারত। কেননা এ ধরনের সরকারের ধারণা আধুনিক গণতন্ত্রে স্বীকৃত । সরকারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর মত প্রধান বিরোধী দলটিরও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ থাকেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মন্ত্রীর কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি তিনিও বিকল্প প্রস্তাবনা পেশ করেন। এভাবে 'ছায়া সরকার' প্রকৃত সরকারের পরিপূরক ভূমিকা পালন

Dhaka University Institutional Repository

করে। পার্লামেন্টে একটি সরকারের নিয়মতান্ত্রিক পতনের পর সেই 'ছায়া সরকার' ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যথাযথ কার্যকারিতার জন্য সরকার ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক সম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। বিরোধী দলকে সরকারের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা রাখতে হবে। সরকারকেও সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

নিচে বিরোধীদল আওয়ামী লীগের ছায়া সরকারের কাঠামো তুলে ধরা হলো ঃ

ছায়া সরকার কাঠামো

প্রেসিডেন্ট		আব্দুস সামাদ আজাদ
প্রধানমন্ত্রী		শেখ হাসিনা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ নাসিম		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আব্দুল জলিল
অর্থ মন্ত্রণালয় ড. মোশাররফ হোসেন		কৃষি মন্ত্রণালয় মতিয়া চৌধুরী
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন		বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমির হোসেন আমু
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সাজেদা চৌধুরী		শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় আব্দুর রাজ্জাক
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুধাংশু শেখর হালদার		পূর্ত মন্ত্রণালয় তোফায়েল আহমেদ
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্ণেল শওকত আলী		ভূমি মন্ত্রণালয় রাশেদ মোশাররফ

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ঐক্যমত্যের সরকার গঠন এবং ছায়া সরকার গঠনের যৌক্তিকতাকে ব্যর্থ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরই মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ৯১ গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাম আজমকে জামায়াতের আমীর ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে ও তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় প্রেসক্লাবের সামনে। সমাবেশে গোলাম আজমের বহিস্কারের দাবী ওঠে ।

৫.২ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারীদল ও বিরোধীদলের মধ্যে মতপার্থক্যের সূচনাঃ

স্বাধীনতার পর ১৯৯২ সাল ছিল উল্লেখযোগ্য বছর। বাংলাদেশের আরেক নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৯২ থেকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ সব সময়ই প্রিয় বিষয়। আর এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে এবারই বিরুদ্ধ পক্ষ রাজাকাররা জড়িত। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিয়েছেন এ সময় (১৯৯২)। কেউ বলেছেন দীর্ঘদিন পর রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা কোন ভেদাভেদ নেই। আবার কেউ এদের পার্থক্য খুঁজছেন যেয়ানত পর্যন্ত। এসব নানা টানাপোড়েন ছাড়া 'গণতন্ত্র' ছিল রাজনীতির অন্যতম বিষয়।

'দৈনিক ইত্তেফাক' এর ভাষ্যকর "গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম" শীর্ষক প্রতিবেদন উল্লেখ করে — "ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সরকার ও বিরোধী দল সকলেই একটি অভিন্ন কথা বলেছেন ঃ তারা প্রত্যেকেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। পূর্ববর্তী বছরে অভাবিত ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ১৯৯২ সালে বাঁধাগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বরং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য সরকারিদল ও বিরোধীদল পরস্পরকে দায়ী করে বক্তৃতা বিবৃতি অব্যাহত রাখে। জাতীয় কোন ক্ষেত্রেই তেমন অগ্রগতি হয়নি।

দুস্কৃতকারীদের গুলিতে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হন এবং কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন নিহত হন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় সর্বহারাদের ধর্মঘাত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা ধান-পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজধানী ঢাকা, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উত্তেজনায় সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠে সর্বদলীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় পার্টির সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। জাতীয় প্রেসক্লাবে পুলিশী হামলা, সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটুনি, যুব কমান্ডের মিছিলকারীদের ধাক্কায় রেলের নীচে কাটা পড়ে ফটো সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করেছে। পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তির জন্য দায়ী তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সাথে আলোচনা শুরুর প্রক্রিয়া সরকারের কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৯২ সালের জুন মাসের প্রথম থেকেই দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন নতুন গতি নিয়ে আরম্ভ হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সরকারী দলকে উদ্দেশ্য করে এক বিবৃতিতে বলেন, বিএনপিকে তিনজোটের অভিন্ন কর্মসূচি অমান্য করে চলার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। এসময় সরকারের দমন নীতিও নির্বিবাদে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে বহুল সমালোচিত গোলাম আযম ইস্যুটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তোলে। জাতীয় সংসদে সরকারি দল গোলাম আজম ইস্যুতে কোনরূপ ছাড় দেয়নি। ফলে বিরোধী দল সেই অধিবেশন থেকে সাময়িক ওয়াক আউট করেন । বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রেখে সরকারী দল কণ্ঠভোটে সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেয়। বিরোধ দলের রাজপথে নামার পূর্বেই রাজপথের দখল নিতে থাকে সরকারী দল।

গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচি আহবান করা হয়। এই কর্মসূচির প্রতি আওয়ামী লীগ, ৫ দলীয় জোট, বামপন্থীদলসহ অন্যান্য ছোট দলগুলোও সমর্থন জানায়।

সংসদের সরকারী দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে গোলাম আযম ইস্যুতে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে। গোলাম আযম প্রশ্নে আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করলে সরকারী দলের এমপিরা এযযোগে হৈচৈ শুরু করে। ফলে আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির দল ও দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ওয়াক আউট করে। এই অধিবেশনে বিরোধী দল আর সংসদে ফিরে যায়নি। এরপর শুরু হয় বাজেট অধিবেশন। বিরোধী দল তাদের অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে বিরোধী দল সরকারের কাছে ৪ দফা দাবি পেশ করে। উক্ত দাবিগুলো সরকার মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদে ফিরে যেতে সম্মতি প্রদান করে।

চারদফা দাবি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১) দেশের প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচার করতে হবে।

২) গণআদালতের উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ২৪ জন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩) রাজনৈতিক মতপার্থক্য নির্বিশেষে সকল দলের সভা-সমাবেশসহ গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৪) বিরোধী দলীয় নেত্রীর মাইক যেকোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না ও সকল সংসদ সদস্যের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

এই ৪ দফা দাবি নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতারা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য কয়েকটি বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। শেষ পর্যন্ত ৩০ জুন সংবিধান সম্মতভাবে প্রচলিত আইনে গোলাম আজমের বিচার ও গণআদালতের ২৪ জনের মামলা প্রত্যাহারসহ ৪ দফার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে বাজেট পাসের দিন আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি ও ন্যাপ সংসদ থেকে আরেকবার ওয়াক আউট করে।

১৯৯২ সালের ১৫ জুলাই বিএনপি সরকার বিশেষ নিরাপত্তা ফোর্স আইন পাস করে। আওয়ামী লীগ ও ৫ দল এ বিলের বিরোধিতা করে। ১৯৯২ সালের ১২ আগষ্ট বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব ১৬৮-১২২ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। এটাই প্রথম বারের মত বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের আইনে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা। ১৯৯২ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকীতে হত্যার বিচারের দাবিতে আওয়ামী লীগ অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। বিরোধী দলের অনেকেই অভিযোগ করতে থাকে যে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বিরোধী দলের আন্দোলন চরমে উঠলে সরকার ১১ অক্টোবর সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ সংসদে পেশ করে। এর সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ ও এর মিত্র দলগুলো সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। সব বিরোধের শেষে ১ নভেম্বর অধ্যাদেশটি পাস হয়ে যায়। ঐদিন জামায়াতে ইসলামীও ওয়াক আউট করে। এরূপ অবস্থায় ৬ নভেম্বর সংসদ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

এদিকে ১৪ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনের সম্মুখের রাস্তায় আয়োজিত বিরাট সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রথম বারের মত জামায়াত-শিবির ও ফ্রীডম পার্টিসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী জানান। এ দাবিতে কয়েকটি অর্ধদিবস ও পূর্নদিবস হরতাল পালিত হয়। সমন্বয় কমিটির আন্দোলনের মুখে সংসদে গোলাম আজম ইস্যু নিয়ে আদালতের মত সওয়াল জবাবের বিতর্ক হয়। কিন্তু বিতর্কের পর স্পীকার কোন সিদ্ধান্ত না দিলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জামায়াত ছাড়া বিরোধী দলগুলো অধিবেশন বর্জন করতে থাকে। পরে আবার সরকারের সাথে বিরোধীদলের ৪ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিরোধী দল সংসদে যোগদান করে। যার মধ্যে ছিল সর্বসম্মতভাবে গোলাম আজমের বিচার, ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা প্রত্যাহার এবং বিরোধীদলের সভা সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা।

এমন অনেক ঘটনা যা বিরোধী দলকে বিরোধ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আর এসবের সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হতে থাকে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন সাপেক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা কেমন ছিল তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

দৈনিক 'আজকের কাগজ' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯২ সালের মূল্যায়ন উল্লেখ করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে পুরো বছর জুড়ে রাজনীতি আলোড়িত হয়েছে গণআদালত কেন্দ্রিক আন্দোলনকে ঘিরে, আর এ সুযোগ হাতছাড়া করেনি প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। সাথে সাথে অন্যান্য দলগুলোও যেমন জাসদ, সিপিবি, পিডিএফ, ৫ দল, গণতন্ত্রী পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো সরাসরি আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। মূল ইস্যু ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, গণরায়ে গোলাম আজমের ফাঁসি কার্যকর করা এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি। এসব ইস্যুতে সংসদের অধিবেশন হয়েছিল উত্তপ্ত। সভা সমাবেশ, মিছিল মিটিং আর হরতালে উত্তপ্ত ছিল রাজপথ। এ ইস্যু রাজনীতির অনেকটা স্থায়ী মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে ।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তিতে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত, ফ্রীডম পার্টি, মুসলিম লীগসহ কয়েকটি দল। এ বিষয়ে সরকার চূড়ান্ত অবস্থান নেয়নি। কখনো কখনো ঝুলে পড়েছেন প্রতিপক্ষ শক্তির দিকে। আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির উপর নির্যাতনের অভিযোগও প্রবল।

আওয়ামী লীগে ড. কামাল গ্রুপ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং নতুন দল গঠনে তারা তৎপর হয়ে উঠে। মেরুকরণ এবং তার অভ্যন্তরীণ প্রভাব বিরোধী দলের জন্য ছিল বড় সংকট। বছর শেষে বাবরী মসজিদ ইস্যু, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস, মস্তানী আর চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এ সবকিছু দেশকে প্রায় অচল করে দিয়েছিল।

সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকার সন্ত্রাস দমন আইন প্রনয়ন করেন । বিরোধীদের আপত্তি ছিল তাদের দমনেই এ আইন ব্যবহৃত হবে।

দৈনিক 'বাংলা বাজার' পত্রিকায় বলা হয়েছে – আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে পুরো বছর কয়েক দফায় সরকারের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে একদফা অনাস্থা প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। কিন্তু সরকার অনাস্থার বিরুদ্ধে সহজেই জয় লাভ করেন। পুরো বছর আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। বছরের শুরুতে জানুয়ারীর ৯ তারিখে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হন ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদল। এই ঘটনা আওয়ামী লীগকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরে কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ আবার নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পুরো বছর আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বড় সাফল্য রাজবাড়ী, গৌরিপুর এবং ভোলার উপনির্বাচনে জয়লাভ। অবশ্য এই তিনটি নির্বাচনই হয়েছে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যের মৃত্যুজনিত শূণ্যপদে।

দৈনিক 'সংবাদে' বলা হয়েছে – সংসদে ১২ এপ্রিল সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। বিতর্ককালে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা গনরায় কার্যকর করার দাবি জানায়। ১৪ এপ্রিল গোলাম আযমের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়। ১৬ এপ্রিল স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াই আলোচনা শেষ হওয়ার ঘোষণা দিলে সংসদ সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তার প্রতিপক্ষের প্রতি ফাইলপত্র ছুঁড়ে মারেন। এক পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। অবশেষে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতেই ১৯ এপ্রিল সংসদে সাধারণ আলোচনার পর গোলাম আযম সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাস হয়। ১৮ জুন সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু বিরোধী দল নির্মূল কমিটির ৪ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৫.৩ মিরপুর ও মাগুরা উপ-নির্বাচন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে বিরোধীদলের আন্দোলন ঃ

মিরপুর উপ-নির্বাচন ঃ

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস বাংলাদেশের রাজনীতিকে গরম করে তোলে মিরপুরের উপ-নির্বাচন। বিএনপি সাংসদ হারুন মোল্লার মৃত্যুতে ৩ ফেব্রুয়ারী এখানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভোট গননা চলাকালেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাত ১০টায় ইংরেজী খবরে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মহসিনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিরোধী আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে ঘেরাও করলে কমিশন ফলাফল সরবরাহের কথা অস্বীকার করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ফেব্রুয়ারী বিএনপি প্রার্থীকে সরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিন প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে এবং ১৩টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন দাবি করে। ৬ ফেব্রুয়ারী রাজধানীতে এর প্রতিবাদে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

আওয়ামী লীগের উপর্যুপরি আন্দোলনের মুখে ১৩ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কমিশন নিরপুর আসনের সকল ফলাফল বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং ভোট পুনরায় গণনার নির্দেশ দেয়। সরকারি দল বিএনপি নির্বাচন কমিশনের এই আদেশের বিরোধিতা করে।

১৫ ফেব্রুয়ারী ভোট পুনরায় গণনা হলে ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে এবং রাজনীতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। ১২ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনা বলেন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে জাতীয় সংসদ থেকে তিনি এবং তার দল পদত্যাগ করবে।

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দেশের রাজনীতি জামায়াত নেতা গোলাম আযমের বিচার ও নাগরিকত্ব প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় সংসদে ২ মার্চ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সমাজের সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর আলোচনায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মতিয়া চৌধুরী বলেন, "আমাদের কৃষকদের অবহেলা করা হয় কারণ তারা রাজপথ, রেলপথ অবরোধ করতে পারে না। এমন একদিন আসবে যখন কৃষক অবরোধ করবে পুরো ঢাকা শহর।"

৩ মার্চ শেখ হাসিনা তথ্য প্রকাশ করে বলেন, মেজর ডালিম ও মেজর পাশা প্রমুখরা জিয়া হত্যার সাথেও জড়িত ছিলেন। ঐ দিন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম অভিযোগ করেন, সরকার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, গোলাম আযম এ দেশের নাগরিক কি অনাগরিক তাতে দেশের মানুষের কিছু যায় আসে না, সে যুদ্ধাপরাধী এবং তার বিচারের রায় কার্যকর করতে হবে।

৫ মার্চ বিদ্বেষমূলক জাতীয় রাজনীতিতে চমক সৃষ্টি করেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এ দিন তিনি বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনার দাওয়াতে ইফতার পার্টিতে যোগদান করে সুস্থ রাজনীতির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

৭ মার্চ সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্যরা রেডিও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের দাবি করেন। বিতর্কে অংশ নিয়ে তোফায়েল

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ বলেন, গত ১৭ বছর যাবত এই দিনকে নিয়ে শুধু অপপ্রচার করা হয়নি অবমাননাও করা হয়েছে। বিএনপি'র মশিউর রহমান আলোচনার সূত্রে বলেন, ৭ মার্চের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ তাতে দ্বিমত করি না।

৯ মার্চ সংসদে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির ইফতার পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী যাননি কেন? তিনি কি রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করেছেন? আজ সংসদ অধিবেশনের শেষ দিনেও প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত।

১০ মার্চ জাতীয় সংসদে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। হেয়ার রোডের বাড়ি ও সাইপেম কোম্পানী সম্পর্কিত দুটি দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। স্পীকার বিরোধী দলকে আলোচনার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নীর সভাপতিত্বে বিরোধীদলকে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে মন্ত্রীকে জবাব দানের আহবান জানালে সংসদে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা ডেপুটি স্পীকারের দিকে প্রায় তেড়ে আসেন এবং 'তুই রাজাকার' 'তুই রাজাকার' ধ্বনি দিতে থাকেন। এই সময় সংসদে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি মীমাংসিত হলেও সংসদের ইতিহাসে দুঃখজনক দিন হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে থাকে।

১৩ মার্চ ময়মনসিংহ জুট মিল লে অফ ঘোষণার প্রতিবাদে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ আহূত লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

১৫ মার্চ থেকে 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ' ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘট শুরু করে। ২৬ মার্চ ছিল গণআদালতের প্রথম বর্ষপূর্তি ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দিন। জাতীয় সমন্বয় কমিটি এই উপলক্ষে ঢাকায় সমাবেশের আয়োজন করলে পুলিশ সমাবেশস্থলে প্রায় 'কারফিউ' পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, বিভিন্ন সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে মিছিল বাঁধা দেয়। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে বহু লোক আহত হয়। পুলিশের বর্বরোচিত হামলায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মারাত্মকভাবে আহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এই তারিখে সরকার সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমাম, আলুর রাজ্জাকসহ অনেক নেতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৮ ধারায় মামলা দায়ের করে।

৩১ মার্চ আওয়ামী লীগ ঢাকা-১১ আসনের নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল মামলা দায়ের করে।

২২ এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেন।

২৫ এপ্রিল গোলাম আজমের নাগরিকত্ব মামলায় হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য সরকার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ১টি আবেদন পত্র পেশ করে। এদিন প্রধানমন্ত্রী বরং বিরোধী দলকেই আক্রমন করে বসেন। লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে এক জনসভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিরোধী দল আজ শুধু সরকার বিরোধী নয়, গণবিরোধীও।"

তবে এদিন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, "বিএনপি এরশাদের চেয়েও বর্বরোচিত আচরণ করছে।"

১০ মে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির কারণে জাতীয় সংসদ অচল হয়ে পড়ে। ডেপুটি স্পিকার হুমায়ুন খান পন্নীর একটি পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তে সংসদে এই অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। সংসদ সদস্য আজিজুর রহমান, মনিরুল হক চৌধুরী, আ.স.ম. ফিরোজ, জয়নাল আবেদীন ফারুক, বরকতউল্লাহ বুলু, সাখাওয়াত হোসেন বকুল প্রমুখ অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে সংসদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেন।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দল সরকারকে সহযোগিতা করছে বলে যে দাবি করা হয় তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যদি যদি হরতাল ডাকাকে সহযোগিতা বলা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হয় সংসদকে কেন্দ্র করে। ৬ জুন সংসদে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় স্পীকারের কাছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে। ২৬ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মক্কা যান হজ্ব পালন উপলক্ষে। সংবিধান অনুযায়ী স্পীকার আপনা-আপনি তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। এই অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দেশে ফিরে না আসায় স্পীকার তখনও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ফলে তিনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে পারেন না।

সরকারি দল এর জবাবে যথাযথ কোন বক্তব্য হাজির করতে পারেনি। ফলে বিরোধী দলের কূটনীতি ও রাজনীতির কাছে সরকারি দল আবারও একবার মার খায়। সংসদের কার্যধারা নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ প্রতিবেদন 'রাউন্ড আপ' প্রচারিত হতো। এতদিন তা বিশিষ্ট সাংবাদিক রকিব সিদ্দিকী করে আসছিলেন। কিন্তু এবারের নতুন অধিবেশনে রকিব সিদ্দিকীর চুক্তি বাতিল করে বিএনপিপন্থী সাংবাদিক দলের নেতা শওকত মাহমুদকে দেওয়া হয়।

শওকত মাহমুদ প্রথম দিনেই পক্ষপাতমূলক অসত্য প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রচার করেন। ফলে পূর্বদিনের রাউন্ড আপ নিয়ে পরদিন ৭ জুন তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, বিরোধী দল 'ওয়াক আউট' করে। পরে সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে অচলাবস্থার অবসান ঘটে শওকত মাহমুদের অপসারনের মধ্য দিয়ে। বলা চলে, টিভি রাউন্ড আপ লিখতে এসে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বিদায় ঘটে শওকত মাহমুদের।

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীদের দূর্নীতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জুন মাসে সংসদে যে বির্তক সৃষ্টি হয় তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বছরের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে। এরপর শুরু পূর্তমন্ত্রীকে নিয়ে। হেয়ার রোডের মন্ত্রীপাড়ার একটি বাড়ি পুনঃসংস্কারে কোটি টাকা খরচ নিয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়।

তবে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রী সম্পর্কিত সংসদীয় বিতর্কে ভালোভাবেই জড়িয়ে পড়েন কৃষিমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম মজিদ উল হক। সংসদে সাইপেক্স ঘটনায় জ্বালানী মন্ত্রী এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রশ্নে, বাণিজ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধী দল কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু জবাব দিতে এসে ফাঁদে পড়েন কৃষিমন্ত্রী। সংসদে কৃষিমন্ত্রী যেভাবে বিপদে পড়েন তাতে মনে হয়, সরকারি দলের অনেকেই ভেতরে ভেতরে উৎসাহী ছিলেন, এমনকি স্বয়ং স্পীকার এই ব্যাপারে বিরোধী দলের পক্ষে জড়িত আছেন এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দৈনিকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন চলে আসে।

পরে এ নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের জেদাজেদিতে একটি সংসদীয় কমিটিও হয়। কিন্তু কমিটি দূর্নীতি তদন্তের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, এর রেশ পরবর্তী বছরেও চলতে থাকে। ১২ জুন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হুদা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

মধ্য জুন ১৯৯৩ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য কর্ণেল আখন্দর হোসেন এক অবাক তথ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ কাঁপিয়ে তোলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি শহীদ হয়নি, হয়েছে ৩ লাখ, রাজাকার সম্প্রদায়ের বানীই ধ্বনিত হয় কর্নেল আখন্দরের মুখে ।

১৬ জুলাই সংসদে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দুর্নীতির অভিযোগ পর্যালোচনায় সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। এদিন সংসদ উপনেতা কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সের ব্যাপারে বিরোধী দলের দাবি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্পীকারকে ১৫ সদস্যের কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব করে বলেন, 'গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষায় আমরা পরীক্ষিত এবং উত্তীর্ণ হতে চাই।' প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধীদলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, 'আমি অভিভূত' সকলে মিলে আমরা গণতন্ত্রের বাঁধা অপসারণ করেছি।'

জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আজম আদালতের রায়ে ১৫ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তির দিন জেল গেটে জামায়াত কর্মীদের তৎপরতার উপর বৈদ্যুতিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১৬ জুলাই দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বসে ১৫টি রাজনৈতিক দল। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে আন্দোলন সুসংহত করতে হবে। ১৯ জুলাই ১৫ দলের ডাকে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো নাজুক অবস্থায় চলে আসে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হরতাল পর্যন্ত পালিত হয়। পয়লা আগস্ট যশোরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আওয়ামী লীগ সারাদেশে হরতাল পালন করে। রাজধানীতে এই হরতালকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্রতিবছরের মত এবারও পঁচাত্তরের খুনী গোষ্ঠী ১৫ আগষ্ট উল্কানীমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখে এবং দৈনিক বাংলার মোড়ে সভা ডাকে। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এরপর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর জন্য শোকসভা এবং দৈনিক বাংলার মোড়ে অবস্থানকারীদের সভা দুটোই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৯৯৪ সালে বহুবিধ রাজনৈতিক সংকট ও টানাপোড়নে গোটা জাতি ছিল বিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পরোক্ষ লড়াই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন, সংসদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এর বাইরে সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিচালিত হয় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিবাদ, বিবৃতি ইত্যাদি মাধ্যমে।

বছরের প্রথম দিনই ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশ নিন্দা ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, ঢাকার মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফের বিজয় মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছয়জনের নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায়। ১ জানুয়ারী এর প্রতিবাদে ঘটনাস্থল লালবাগ এলাকায় হরতাল পালিত হয় এবং নিহতদের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়।

৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশন শুরু হয়। বরাবরের মত এবারও বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণের সময় ওয়াক আউট করে।

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে দুর্নীতি নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দল তুমুল বাকযুদ্ধ শুরু হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি দল অভিযোগ করে, বিরোধী দল সংসদকে অকার্যকর করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে অন্য কোনো ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করছে। দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ না দেয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলের ওয়াক আউটের সঙ্গে সঙ্গে সংসদের বৈঠক মুলতবি হবার পর সংসদ উপনেতার পক্ষে আহুত এক প্রেস ব্রিফিং এ দলের নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ করেন।

ব্রিফিং এর শুরুতে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা দেখছেন সংসদে কি হচ্ছে, কিভাবে অহেতুক ইস্যু সৃষ্টি করে সংসদকে অকার্যকর করা হচ্ছে। এতে কারা লাভবান হবে সবাই তা বোঝে। ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার বলেন, সংসদে কথা বলার অধিকার সবারই আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা প্রতিদিন অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করবে। সম্পূরক প্রশ্নের নামে যখন তখন পয়েন্ট অব অর্ডারের নামে সময় নষ্ট করে সংসদকে আমরা যেদিক নিয়ে যাচ্ছি তা জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেন, চলতি অধিবেশনে অনির্ধারিত বিতর্কের কারণে এ পর্যন্ত একটি বিলও পাস করা হয়নি।

মন্ত্রী আরো বলেন, দুর্নীতি মানুষই করে। আমরা কেউ অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। তবে শুধু মন্ত্রী হিসেবেই নয়, বিরোধী দল থেকেও কেউ দুর্নীতি করতে পারে। দুর্নীতি নিয়ে সংসদে আলোচনাও হতে পারে। তবে তা অবশ্যই ডকুমেন্টের ভিত্তিতে হতে পারে।

৩ মার্চ বিএনপি মহাসচিবের একটি বিবৃতির প্রতিবাদ করে পাল্টা বিবৃতি দেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম। জাতীয় সংসদে দেয়া শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার যে বিবৃতি দেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম তাকে অশালীন ও অশোভন বলে নিন্দা করে।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, সংসদের চলতি অধিবেশনে দুর্নীতির আলোচনার এক পর্যায়ে সরকারি দল আলোচনায় রাজি হয়েও নিজেদের থলের বেড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যায়। বিরোধী দলীয় নেত্রী এই বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জগন্নাথ কলেজে সন্ত্রাসীদের হাতে পুলিশের দারোগা বরহাদ নিহত হলে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, বর্তমান সরকারের হাতে জনগণের জানমাল নিরাপদ নয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজন করা হয় এক ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের। ১৯৭১ সালে এই দিনটিতে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থানটিতে বিশাল জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই ঘোষণা স্থলে ৭ মার্চ দেশের কয়েকজন তরুন কবি পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কাব্য পাঠ করেন হৃদয়ের সবল অর্গল খুলে দিয়ে। স্বাধীনতার ঘোষণাস্থলে দাঁড়িয়ে কবিরা ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে প্রতিবছর ৭ মার্চ এই ঐতিহাসিক ঘোষণাস্থলে বেলা সোয়া তিনটায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও কবিতা পাঠ করা হবে। শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে যেভাবে গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্য তেমনি ৭ মার্চের ঘোষণা মঞ্চকে কেন্দ্র করে আরেকটি ঐতিহ্য গড়ে উঠবেই।

মাগুরা উপ-নির্বাচনঃ

১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিএনপি ব্যাপক কারচুপি করেছে বলে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল অভিযোগ করে। পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ২১ মার্চ মাগুরায় হরতাল পালন করে।

২২ মার্চ দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ স্মরণ উৎসবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লালন এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের সঠিক ধারায় সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এর আগে মুক্তিযুদ্ধ স্মরণ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার ২২ বছর পরও জাতিকে সঠিক ইতিহাস জানতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাঙালি জাতির বীরত্ব গাথা ইতিহাস নতুন প্রজন্ম জানতে পারছেনা।

২৩ মার্চ মাগুরা-২ আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগের আহবানে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু ও ৩ নভেম্বর জেলখানায় চার জাতীয় নেতার হত্যাকান্ডের পর থেকে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য কালো টাকা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ মার্চ ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র ১৬ জন সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের একাংশের প্রতিবাদে করেন এবং তাকে সংযত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বিবৃতিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে শেখ হাসিনার বক্তব্যকে মিথ্যা ও অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করে বলা হয়, সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা শুধু মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতই নয় বরং কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর। বিবৃতিতে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে অভিযোগসমূহ প্রত্যাহারের দাবি করা হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয় সংসদের ভেতরে বাইরে বিরোধী নেত্রী প্রায়ই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মর্যাদা রক্ষার কথা বলে থাকেন। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমন মানহানিকর মিথ্যা, অবাস্তব অপবাদ আরোপ করেছেন যা তার পদমর্যাদা ও পরিচয়ের সাথে পুরোপুরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের সচিবালয়ের ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে সরকারি দলের প্রাইভেট বাহিনীর গুলিতে ২ জন ছাত্রসহ ৩ জন নিহত হয়। মাগুরা উপ-নির্বাচনের ফলাফল বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এই ঘেরাও কর্মসূচি আহ্বান করা হয়। আওয়ামী লীগ নিহতের সংখ্যা দাবি করে ৬ জন। এর মধ্যে ৩ জনের লাশ পুলিশ গুম করেছে বলে দলীয় সূত্রে অভিযোগ করা হয়। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ গুরুতর আহত হন। লাঠিচার্জ ও গুলিতে মাত্রাধিক দলীয় নেতা কর্মী, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ আহত হন। এদের মধ্যে ৩০ জনের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ অন্তত ৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ঘেরাও কর্মসূচি ঠেকাতে সকাল থেকেই সচিবালয় ও এর আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিশ্চিদ্র ব্যারিকেড দিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করে রাখে। রাজধানীর অন্য রাস্তাগুলোতে পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুরো নগর কার্যত এক অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।

ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে হত্যাকান্ড, গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ এপ্রিল রোববার ও ২৬ এপ্রিল মঙ্গলবার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টা থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গতে শুরু করে। এভাবে তারা প্রেসক্লাব, জিপিও, হাইকোর্ট এলাকা এবং আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ শেষে বেলা ১২টার দিকে হাজার হাজার মানুষ নূর হোসেন চত্বরের দিকে এগুতে থাকে। এ সময় পুলিশ বিনা উস্কানিতে বেপরোয় লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের আক্রমনে এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন। একই সময় আহত হয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা জামাল মহিউদ্দিনসহ ৫০ জন কর্মী, সমর্থক ও নিরীহ মানুষ।

পুলিশ অনুরূপভাবে কার্জন হল, দৈনিক বাংলার মোড়, প্রীতম ভবন, গুলিস্তান, যদুলবাড়িয়া, পল্টন, বিজয়নগর, মৎস্যভবন, নবাবপুর, ঠাটারী বাজার, নর্থ সাউথ রোডসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পথচারী, রিক্সাওয়ালা, হকারদের উপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশের এই তান্ডবে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে এক ভয়ার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পথচারীরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। বেলা ১টার দিকে কাপ্তান বাজার ও নর্থ সাউথ রোডে অবস্থিত বিএনপি ও যুবদল কার্যালয় এলাকা থেকে সরকারী দলের সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী কাটা রাইফেল, পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। গুলিতে এ সময় নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোস্তফা আমিনুর ঘটনাস্থলে, রুস্তম আলী হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র আজিজুল হক মিলন হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায় এবং অজ্ঞাত পরিচয় একজন শ্রমিকও নিহত হয় বলে স্থানীয় লোকজন জানায়। এ ঘটনায় রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র হুমায়ুন কবিরের তলপেটে এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মাথায় গুলি লাগে। আশংকাজনক অবস্থায় দু'জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে, সরকারি দলের প্রাইভেট বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পুলিশ সার্জেন্ট ফরহাদ হত্যা মামলার পলাতক আসামী ছাত্রদল নেতা হানিদুর রহমান ও সূত্রাপুর থানা যুবদল সভাপতি নাসির। পুলিশের সহায়তায় বিএনপি'র সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঘটনায় স্থানীয় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল করে তারা নবাবপুর, গুলিস্তান হয়ে গোলাপ শাহ মাজার পর্যন্ত চলে আসে। বিক্ষুব্ধ জনতা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের লটারির টিকিট বিক্রির ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশ জনতা ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলে। সিদ্দিক বাজার ও নবাবপুরে জনতা যুবদলের অফিস ভাংচুর করে। এ সময় কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে ছুরি ও চাপাতির আঘাতে আহত করা হয়। বেলা ২টার দিকে এখান থেকে আবার সরকারি দলের সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। এখানে দু'দফা গুলিবর্ষণের ঘটনায় উল্লিখিত নিহত ও আহতরা ছাড়াও ৩৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

৭ এপ্রিলের সচিবালয় ঘেরাও ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রেসনোট জারি করে। এতে বলা হয় সরকার এই দুঃখজনক অপমৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে। ইতোমধ্যেই হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সোপর্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে যুক্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সরকার বিদ্যমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকল প্রকার কার্যক্রম সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে যে, সামগ্রিক জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সকলেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহনশীলতা প্রদর্শন করবেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে সহিংসতা এবং বে-আইনী কার্যকলাপ পরিহার করবেন। সরকার এ ব্যাপারে সচেতন জনগণেরও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সালাম তালুকদারের বিবৃতি ঃ

২৩ এপ্রিল বিএনপি'র মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার বিরোধী দলের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, গত সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি কিংবা ক্ষমতা হারানোর বেদনা তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে বলে এমন আচরণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছি। সালাম তালুকদার বলেন, সরকারের কর্মকান্ডে কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে, যা বিরোধী দলের বন্ধুদের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শে তার সংশোধনী ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। দেশ ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রচলিত নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করে, পবিত্র সংবিধানকে অমান্য করে, গণস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নির্বাচনে পরাজিত কোন দল পতিত স্বৈরাচারের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জনগণকে জিম্মি এবং উন্নয়নের ধারা পঙ্গু করে দেবে এটা হতে দেয়া যায় না।

মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি বিষয়ক দাবিকে হাস্যকর ও অবাস্তব হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যারিস্টার তালুকদার বলেন, এই নির্বাচনে কোনো ত্রুটি দেখে থাকলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আপিল করবেন এটাই নিয়ম। কিন্তু তা না করে তারা অবিরাম হরতাল ঘেরাও করে চলেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন। তারা আদায় করতে চান রাজপথে। যুক্তির পরিবর্তে শক্তি দিয়ে তারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে চান। দেশের উন্নয়ন, জনগণের শান্তি, সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি কোনটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি বলেন, তাদের দলীয় সন্ত্রাসীরা প্রতিপক্ষের কর্মীদের হত্যা করতে পারবে কিন্তু বিএনপি তার দলীয় কর্মীদের লাশও দাফন করতে পারবে না ?

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সন্ত্রাস দমন আইনে বিরোধী দলের কিছু বন্ধু সন্তুষ্ট হতে পারেননি, প্রধানত দুটি কারণে, একটি হল এই আইন প্রয়োগের ফলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাদের ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন পূরণ হওয়া দুষ্কর হবে, অন্যটি হল এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে তাদের বেশ কিছু সন্ত্রাসী নেতা-কর্মীর আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সংসদীয় রাজনীতির সকল প্রতিষ্ঠিত বিধান লংঘন করে বিতর্কিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন সংসদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন। প্রতিনিয়ত অশালীন ভাষা ব্যবহার করে সংসদে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের চরিত্র হননের উদ্দেশ্যমূলক অপচেষ্টা চালিয়েছেন, সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারকে অপদস্থ করার জন্য পবিত্র সংসদ কক্ষে পেশীশক্তি প্রদর্শন করেছেন এমনকি অন্য দলের সংসদ সদস্যদের পাদুকা প্রদর্শন থেকে শুরু করে ফাইল ছুঁড়ে মারা ও মাইক ভেঙ্গে ফেলা পর্যন্ত হেন অসাংবিধানিক অসংসদীয় আচরণ নেই যা তারা করতে বাকি রেখেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে পরাজিত ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কতিপয় দল ও ব্যক্তি দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে বিরাজমান গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীতে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু সরকার দাবি মানার প্রশ্নে অনমনীয় নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষকদের এক সভায় বলা হয়, শিক্ষকের শতকরা ৭০ ভাগ বেতন ভাতা দিতে যেখানে মাত্র ৫শত ২৬ কোটি টাকা লাগে সেখানে শতকরা ৩০ ভাগের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা লাগার শিক্ষামন্ত্রীর হিসাব হাস্যকর। প্রকৃতপক্ষে এর জন্য অতিরিক্ত ১শ ৭৬ কোটি টাকা লাগবে। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী এ ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ৩২ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানান।

স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও ফতোয়াবাজদের তৎপরতা প্রতিরোধ ৩১ মে রাজধানীসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ২ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার সূত্রাপুর থানার র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে কোটিপতি ব্যবসায়ী রতন মিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৬ জুন বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। এর আগের দিন সংসদ ভবনে কে বা কারা জাতীয় পতাকা নামিয়ে পাঁচতারা পতাকা উত্তোলন করে। এতে সারাদেশে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

৬ জুন সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে বিএনপি'র সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উন্মুক্ত বিতর্কের আহবান জানান। তিনি বলেন, বির্তকের বিষয় থাকবে একটি "আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই আর বিএনপি চায় না।" সংসদ নেত্রী তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেবেন আর আমি আমাদের দাবির সমর্থনে যুক্তি দেখাবো। কিন্তু বিতর্ক হতে হবে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে। রেডিও টিভিতে সরাসরি তা সম্প্রচার করতে হবে। হাজারো মানুষের মুহুর্মহু শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, একটি জাতির পরিচয় হচ্ছে তার পতাকা। কিন্তু বিএনপি এই পতাকাটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। চলমান আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য নিজেরাই এই কাজ করেছে। তারা ষড়যন্ত্র করছে গণতন্ত্র ধ্বংসের। এ সরকার আর বেশী দিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ রসাতলে যাবে।

বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুফল তো আপনারাই ভোগ করছেন। এই দাবি মেনে নিয়ে জনগণকে আবার স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার অধিকার দিয়ে আবারও তাদের ম্যান্ডেট নিন। জনসমর্থন থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এত ভয় কেন ? তিনি বলেন, মাননীয় স্পীকারের সাথে আলোচনায় আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি, আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানাচ্ছি না। মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের এই দাবি। কারণ কয়েকটি উপ-নির্বাচনে একথা প্রমাণিত হয়েছে। এই সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন আজ জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যখন সংসদে থাকি প্রধানমন্ত্রী তখন সংসদে যান না। আমরা যখন সংসদে থাকি না প্রধানমন্ত্রী তখন সংসদে বসে থাকেন। তিনি রাজপথে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান।

তিনি সরকারের পদত্যাগ ও অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান বলেন, দেশ ও সংসদ যেভাবে চলছে তা স্বাভাবিক নয়। তাই এই সরকারের পরিবর্তন দরকার। সাজেদা চৌধুরী বলেন, সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিসহ পররাষ্ট্র নীতিতেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তোফায়েল আহমদ বলেন, সংসদে ৪৫ মিনিট জাতীয় পতাকা ছিল না এটা কোনো দেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জাতীয় সংসদের বিগত ২৯২ কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন মাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টা।

৭ জুন জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে আবারো ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মঙ্গলবার ভোরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় কে বা কারা একটি ফলক স্থাপন করে। এতে লেখা ছিল, জাতির জনক স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।

ভোর থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ফলকটি সেখানে স্থাপিত ছিল। পরে বেলা দুটোর দিকে সেখানে গিয়ে তা দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৮ জুন খালেদা জিয়া বলেন, তিনি উন্মুক্ত বিতর্কে রাজী তবে তা হতে হবে সংসদে। শেখ হাসিনা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৫ জুন বেসরকারী শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন শুরু করে। এরপর শিক্ষামন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে অনুদান ৭৫ ভাগ বহাল হবে। ১৭ জুন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অনশনরত শিক্ষকের অনশন ভঙ্গ করান।

২৩ জুন গোলাম আজম প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অতীতে আমার ভুলের যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন তবে তাদের বেদনার সঙ্গে আমিও শরীক। ভুল মানুষের হতেই পারে।

২৭ জুন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে তার সভাকক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন।

ফতোয়াবাজ ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আহুত তথাকথিত ২০ জুনের হরতাল প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম প্রমুখের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচার, গণআদালতের রায় কার্যকর করাসহ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবানে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জুন রাজপথ দখল করে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মত বিনিময় সভায় গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে ২৬ জুন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক জোটের নাগরিক সমাবেশ, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশ অনুষ্ঠান, ৩০ জুন রাজপথ দখল করে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন, সারাদেশে গোলাম আজমের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা, সারাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রার মতো ফতোয়াজ মৌলবাদ বিরোধী অভিযাত্রা, আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কর্মীদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখা উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ জুন এক সভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কে দিয়েছে। মদদ পেয়ে এই অপশক্তি দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। ধর্ম ব্যবসায়ীদের এই গোষ্ঠী জনবন্ধসহ স্বাধীনতার পক্ষের পত্রিকাগুলোর উপর হামলা চালাচ্ছে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব নস্যাতের। তাঁরা বলেন, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলেন, অপরদিকে পত্রিকার উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রেফতার করেন সাংবাদিকদের। ফলে এই অপশক্তি সাহস পায় দেশে হরতাল ডাকার। তারা ৩০ জুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এখন এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। সমাবেশে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোলাম আজম আজ জাতির কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু দুই লাখ লাঞ্ছিত মা-বোন, ৩০ লাখ শহীদের আত্মীয় স্বজন কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? যুদ্ধাপরাধী এই ঘাতকের বিচার বাংলার মাটিতে একদিন হবেই। তিনি বলেন, মতিউর রহমান নিজামী দেশে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। আমরা আজ গৃহযুদ্ধ মোকাবেলায় প্রস্তুত। খেলা যখন শুরু হয়েছে তা রাজপথেই হউক। তিনি ৩০ জুন রাজপথে গোলাম আজমের সহযোগীদের প্রতিহত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

২৯ জুন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংসদে বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী দল ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাকে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে অভিযুক্ত করেন। একই তারিখে সংসদে বাজেট পাস হয়।

অবশেষে ৩০ জুন ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিচ্ছু বিচ্ছু পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এসব সহিংস ঘটনায় কিশোরগঞ্জের একজন স্কুল ছাত্র নিহত এবং ঢাকাসহ সারাদেশে প্রায় ৩ শত জন আহত হয়।

রাজধানীতে সর্বাত্মক হরতালের সময় ধর্ম ব্যবসায়ীদের মসজিদ কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং জনবন্ধসহ প্রগতিশীল সংবাদপত্র কর্মীদের খোঁজাখুঁজির ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। তারা এতটাই উগ্র ছিল যে, জামায়াতের ইসলামীর মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রামের একজন সাংবাদিককেও তাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। এছাড়া লাঞ্ছিত হয়েছে আরো কয়েকজন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের দুটি গাড়ি ভাংচুর করা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনবন্ধসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীটি নরসিংদীতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসে হামলা চালিয়ে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকায় আগুন লাগিয়ে তাদের জন্য সুবিধাজনক বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে রাজধানী জুড়ে।

১৭ জুন গোলযোগে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। আহত পুলিশের মধ্যে ২ ইন্সপেক্টর, ১ দারোগা, ১ সুবেদার, ৪ সার্জেন্ট ও ৭ জন কনস্টেবল ছিলেন। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর ৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। অন্য ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠনগুলো ভোর পৌনে চারটা থেকে রাজপথে নামেন এবং মৌলবাদীরা ফজর নামাজের পর রাস্তায় নেমে আসে। উভয়পক্ষই রাজপথে নামার পর ভোর থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও তাদেরকে অধিকাংশ সময় চুপচাপ দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ ভোর চারটা ৫০ মিনিটে তোপখানা এলাকায় প্রথম মিছিল করে। মিছিলটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পল্টন মোড় পর্যন্ত বেশ কয়েকবার চক্কর দেয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠন মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাব এলাকায় পৌঁছায়। বেলা ১০টা নাগাদ এই এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং সংগঠনসমূহের মিছিল আর শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো চত্বর। মাঝে মাঝেই সংগঠনগুলো সমবেত সমাবেশ করে মৌলবাদীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রেসক্লাবের সামনে প্যারোডি ও জারিগানের আসর বসায়, বিকালে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজের সমাবেশ শুরু হওয়া পর্যন্ত সারাদিন এই এলাকায় দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। ৩ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানীতে গণমিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা।

৩ জুলাই শেখ হাসিনা ঢাকায় এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মাসে এক কোটি ২০ লাখ টাকা ভাতা নেন। ৭ জুলাই বিএনপি মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার এর প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁর মন্তব্যে যে যে শব্দ চয়ন করেছেন, তা অত্যন্ত অশোভন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর মতো একজন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এ ধরনের অসত্য, দায়িত্বহীন ও অশোভন উক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি মহাসচিবের বিবৃতিতে আরো বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরকারের প্রধান নির্বাহীর অফিস। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয় বাবদ এ বছরের বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে ১০ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বেতন-ভাতা, দান ও জনকল্যাণের ব্যয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চার শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, পরিবহন পুলের যাবতীয় ব্যয় এবং রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যয়। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলীয় নেত্রী যে অর্থের উল্লেখ করেছেন তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক মাসিক গড় ব্যয়েরও বেশী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মোট গড় মাসিক খরচ এক কোটি টাকারও কম।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক বেতন বাজেট বরাদ্দ এক লাখ ৭০ হাজার টাকা। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিরোধী দলীয় উপনেতার বিভিন্ন ভাতা ছাড়াই বার্ষিক বেতন বাবদ বাজেট বরাদ্দ দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর বেতন ভাতা প্রায় সমান। আরো উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাসিক বেতনের টাকা নিজে গ্রহণ না করে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় দান করে থাকেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয়কে প্রধানমন্ত্রীর ভাতা হিসেবে দেখিয়েছেন। এভাবে হয়ত দেখা যাবে তিনি সমগ্র সরকারের খরচকে প্রধানমন্ত্রীর ভাতা হিসেবে চিহ্নিত করবেন। সরকারের প্রশাসন এবং রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলন ঃ

১৯৯৪ সালের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয় দেশের পরবর্তী নির্বাচন কিভাবে এবং কেমন সরকারের অধীনে হবে এই প্রশ্নকে ঘিরে। বিরোধী দল সারা বছর সংসদ এবং সংসদের বাইরে এ ব্যাপারে সরকারি দলের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে বিরোধী দল আংশিক সফলতা লাভ করে বলা যায়। কারণ সাধারণ মানুষ, এমনকি বিএনপি সমর্থকদের একটি অংশ বলতে থাকেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে দোষ কোথায়।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা এমন এক পর্যায়ে যায় যে, বিএনপির একাধিক মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যও এই দাবির প্রশ্নে সরকারের বিপরীত অবস্থানে গিয়ে প্রকাশ্যেই বক্তব্য রাখতে থাকেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বিষয়ে ছিলেন নির্বিকার। তবে বছরের প্রায় শেষ ভাগে তিনি এক জনসভায় ঘোষণা করেন, নির্বাচনের এক মাস আগে পদত্যাগ করতে রাজি আছি।

তবে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সম্মিলিত ঘোষণা দিতে ২৭ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর আগে এই প্রশ্নে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা দাবির প্রশ্নে অটল মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ১৯৯৫ সালের প্রথমার্ধে তাঁরা সংসদ থেকে এই প্রশ্নে পদত্যাগও করেন। ২৭ জুন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা ঘোষণা করেন। নিম্নে এর রূপরেখা প্রদান করা হল ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ বার বার বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক একটি সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চর্চা যেহেতু এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার তাগিদ এখন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।

এই লক্ষ্য অর্জনে বিরোধী দলসমূহ সংসদে তিনটি বিলও পেশ করে এবং ঐ বিলসমূহ আলোচনার জন্য দাবি রাখে। কিন্তু সরকার তাতে কোন সাড়া দেয়নি। এরপর বিরোধী দলসমূহ ২৬ জুনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনকল্পে সংবিধান সংশোধনীর একটি বিল উত্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু সরকার সেই বিল না এনে সংসদকে আরো অকার্যকর করে দেয় এবং অগণতান্ত্রিক ও একগুয়েমি মনোভাব নিয়ে আজ জাতিকে গভীর সংকটে নিমজ্জিত করেছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা নিম্নরূপ হবে ঃ

একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে —

Dhaka University Institutional Repository

১) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

২) রাষ্ট্রপতি এই অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন।

৩) অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবে না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৫) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬) সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের ৩য় দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হবে। এছাড়া এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে ঃ

ক) নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

গ) উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালে ছিলেন সকল আলোচনা এবং সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তার রাজনীতির রণনীতি ও রণকৌশল বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিলেও তাঁর ভূমিকায় সরকারি দল ছিল সদা সন্ত্রস্ত। শেখ হাসিনা তাঁর সরকার বিরোধী ভূমিকা বা তৎপরতার ক্ষেত্রে কতটুকু সফল

Dhaka University Institutional Repository

বা বিফলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্যায়নে না গিয়েও নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিএনপি সরকারের সমগ্র মেয়াদটি ছিল হাসিনা ভীতিতে তটস্থ।

নিউইয়র্ক টাইমস এর প্রতিবেদনে '৯৪ সালের রাজনৈতিক চিত্র ঃ

১৬ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা তসলিমা নাসরিন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, সরকার ও বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রথম পাতায় বেশ বড় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে অবশ্য তসলিমাকে সমর্থন করা হয়। পাশাপাশি সরকার ও বিরোধী দলের সমালোচনা করা হয়।

নিউইয়র্ক টাইমস আরো কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছে। তারা এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সম্পর্কের কারণে বর্তমান সরকারের পতনও ঘটতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার দেশের সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে, জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় বসে। কিন্তু বর্তমানের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে জনপ্রিয়তা অনেকটা কমে এসেছে। প্রায় ৪ মাসকাল বিরোধী দলগুলো সংসদ অধিবেশন বর্জন করে চলেছে।

১৯৯৫ সালের সমগ্র সময়টি রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যয় হয় জাতীয় সংসদে থেকে সকল বিরোধী দলের সদস্যদের একযোগে পদত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯২ সাল থেকে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন আন্দোলনের দাবিতে বিরোধী দল যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালেও বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সালের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় এই বিষয়ক সংবাদই গুরুত্ব লাভ করে। ১ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর এক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের নির্বাচন ফলাফলে বিরোধী দলসমূহ পেয়েছিল শতকরা ৬৯ ভাগ ভোট। বিএনপি পেয়েছিল শতকরা ৩১ ভাগ ভোট। সংসদ থেকে শতকরা ৬৯ ভাগ ভোটারদের প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করার পরে এই সংসদের কোনো বৈধতা নেই। বর্তমান সংকট থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়ার একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অবিলম্বে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া এবং নির্দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। বিএনপি'র ক্ষমতালিপ্সাই আজ দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। সরকার যদি বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি উপলব্ধি না করে ক্ষমতা আকড়ে রাখতে চায় তাহলে তারা দেশকে আরো সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।

কিন্তু একই দিনের পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এক জনসভায় এই সম্পর্কিত বক্তব্যও প্রকাশিত হয়। রাজবাড়ীর পাংশায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদত্যাগ পত্র পেশের মাধ্যমে বিরোধী এমপিরা জনগণের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

তাদের পদত্যাগ পত্র পেশের পর বর্তমান সংসদ অবৈধ হয়ে গেছে বলে বিরোধী দল প্রদত্ত বিবৃতির কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংসদে সম্পূর্ণ বৈধ ও সংবিধানসম্মত। এই সংসদে ১৭২ জন নির্বাচিত সাংসদ রয়েছেন। অতএব এই সংসদ বৈধ। সংবিধান এবং বিধি মোতাবেকই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবো।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১ জানুয়ারী খৃষ্টীয় নববর্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও বাংলাদেশ থেকে একই সঙ্গে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সরকার ও বিরোধীদল উভয়েরই। জনগণকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, যে বিষয় নিয়ে বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংসদ ত্যাগ করেছেন তা নিষ্পত্তির জন্য আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না এবং এখনো নেই। তিনি আরো বলেন, তারা যা চেয়েছিল, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আমরা তার কোনটাই করতে বাকি রাখিনি। একটি সমাধানে পৌঁছার সময় এখনো আছে। তিনি বলেন, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব থেকে কোন পক্ষ সরে আসলে দেশবাসীর কাছে তাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে। বেগম জিয়া বলেন, আমি আশা করি, বিরোধী দল এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান পরদিন ২ জানুয়ারী সংবাদপত্রে বলেন, এই ভাষণে নতুন কোন একটি কথাও সংযোজিত হয়নি। গত ক'দিন ধরে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেসব কথা বলে বক্তৃতা করেছেন, এই বক্তৃতা হুবহু তারই প্রতিধ্বনি। সমগ্র জাতি আবারও হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দাবি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে সংসদ ভেঙ্গে নয়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বক্তৃতা শেষে প্রধানমন্ত্রী হুমকির যে আভাস দিয়েছেন, বিরোধী দল ঐসব হুমকির কাছে মাথানত করতে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর থেকে না আসাই ভালো।

এদিকে ২ জানুয়ারী থেকে রাজধানীতে বিরোধী দলের ডাকে তিনদিনের হরতাল শুরু হয়।

৮ জানুয়ারী, প্রধানমন্ত্রী যান চট্টগ্রামে। সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, ২৫ বছরের শৃঙ্খলিত জীবনের পরিসমাপ্তির ঠিক আগ মুহূর্তে এক শ্রেণীর বিরোধী দল একটি নির্বাচিত সরকারকে অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। তারা চায় তাদের প্রভুদের মাধ্যমে এদেশের ১২ কোটি মানুষকে শৃঙ্খল পরাতে। বিএনপি সরকার এ শৃঙ্খলকে বিকল করে রেখেছে এবং তা কখনোই হতে দেবে না। বিএনপি চেয়ারপার্সন বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রসঙ্গে বলেন, পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের সরকার নেই।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঢাকাতে আয়োজিত এক সমাবেশে এদিন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধান সম্মতভাবে স্পীকারের কাছে বিরোধী দলের সদস্যরা পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। অতএব তা নিয়ে আর টালবাহানার অবকাশ নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের এক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা দেয়া হলো ২৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ করার পরদিন। এই বক্তৃতা যদি তিনি ২৪ ঘন্টা আগে দিতেন তাহলে আমরাও পদত্যাগ করতাম না, সংসদও চলত, তিনি ক্ষমতায়ও থাকতে পারতেন।

নির্বাচনের এক মাস আগে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, দিন শেষ হয়ে যাবার পর হলেও আপনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝেছেন এবং পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। দিনক্ষণের বিষয় নয়। জনগণ দেখতে চায়, আপনি পদত্যাগ করতে চেয়েছেন, পদত্যাগ করবেন। নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিরোধী দলের ফর্মূলা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দাবি জানিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দলের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ পরিচালনা করবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হবে নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করা, সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা এবং শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের ৩য় দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার বিলুপ্ত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী সভানেত্রী বলেন, এটাও যদি না মানেন, তাহলে অন্তত রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ উপদেষ্টামন্ডলী দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করারও সুযোগ রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি জনসমক্ষে যে কথা বলেছেন, সে কথা থেকে পিছপা হলে বাংলার জনগণ তা মেনে নেবে না। সমবেত জনগণ এটা মানবে কিনা জানতে চাইলে তারা গগনবিদারী আওয়াজ 'না' 'না' উচ্চারণ করেন।

১১ জানুয়ারী মুন্সিগঞ্জের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন দুই ধরনের প্রবণতা রয়েছে। একটি হচ্ছে উন্নয়নের প্রবণতা যা সরকার পরিচালনা করছে অন্যটি হলো বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা। তিনি আরো বলেন, সংসদ থেকে এমপিদের পদত্যাগসহ তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়ার পরিবর্তে নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে হঠানোর লক্ষ্যে তারা রাস্তায় নেমেছে। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন যে, রাস্তায় আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি জনগণের সমস্যা সমাধান এবং ভালো আইন পাস করতে পারবে ? তিনি বলেন, সরকারের বিরোধিতা করার জন্য অন্য কোন ইস্যু না পেয়ে বিরোধী দল তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু উত্থাপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। কোন মনোনীত ব্যক্তি দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। অনির্বাচিত ব্যক্তি দেশ পরিচালনা করলে তা হবে সংবিধান বিরোধী এবং জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ। বিএনপি সরকার এমন কিছুই করবে না, যা সংবিধান বিরোধী।

১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যশোরের নওয়াপাড়ার জনসভায় ভাষণ দানকালে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সাংবিধানিক রাজনীতিতে ফিরে আসুন।

১৩ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের এক পদযাত্রা কর্মসূচি উদ্বোধনকালে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের ৩০ দিনে আগে নয়, তফসিল ঘোষণার সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তিনি বলেন, আপনি পদত্যাগ করবেন বলেছেন, বরখেলাপ করবেন না। ঘোষণা থেকে সরে গেলে জনগণ আপনাকে ছাড়বে না। শেখ হাসিনা ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ এনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে দোষারোপ করে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে নতুন ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বলেন, এর পরিণতি ভালো হবে না। আমরা তাকে নিরপেক্ষ দেখতে চাই।

১৫ জানুয়ারী কুমিল্লায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জাতীয় সংসদে ফিরে এসে তাদের উপর জনগণের অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিরোধী দলের প্রতি পুনরায় আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। যারা জনজীবনে দুর্ভোগের সৃষ্টি করবে, দেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১৮ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী বিভাগের বিএনপি সম্মেলন উদ্বোধনকালে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। কারণ, দ্বাদশ সংশোধনী আমরা একা করিনি। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ফর্মূলা বিরোধী দল দিয়েছে জনগণ তা গ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯ জানুয়ারী দেশব্যাপী বিরোধী দলের ডাকে রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।

২২ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উস্কানির কারণেই আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছি। সভায় তিনি বলেন, আমাদের পদত্যাগের সময় সারাদেশের প্যানিক সৃষ্টি করা হয়েছিল দেশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সাংবিধানিকভাবে পদত্যাগ করে চুপচাপই ছিলাম। সংঘাত নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, সংসদে ১৪৭ জন বিরোধী দলের সদস্যকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল।

এদিকে ২২ জানুয়ারী থেকে সারাদেশে শুরু হয় ৭২ ঘন্টার রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি। প্রথম দিনে চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় একজন, দ্বিতীয় দিন নারায়ণগঞ্জে ২ জন নিহত হয়। শত শত মানুষ এই ৩ দিনের সংঘর্ষে আহত হয়। বিভিন্ন স্থানে রেললাইন পর্যন্ত বিক্ষোভকারীরা তুলে ফেলে।

২২ জানুয়ারী গোপালগঞ্জ সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচিতে বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারতের কোন কর্মসূচি না থাকলেও তিনি দুপুর ১টায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করতে যান এবং প্রায় ৫ মিনিট সেখানে অবস্থান করেন।

২৩ জানুয়ারী রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে তিনটি প্রধান বিরোধী দল মিছিল নিয়ে টিভি ভবন ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় বিস্ফোরণ এবং পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলে রামপুরা থেকে মালিবাগ রেল ক্রসিং পর্যন্ত সড়কে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘেরাও কর্মসূচির আগে এক সমাবেশে বলেন, রেডিও টেলিভিশন জনগণের টাকায় চলে। সেখানে প্রতিদিন একই চেহারা দেখতে জনগণ রাজি নয়। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসন দিন, নইলে গদি ছাড়ুন।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ জানুয়ারী রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ফার্মগেটসহ কয়েকটি স্থানে পুলিশ হরতাল সমর্থকদের বেধড়ক লাঠিপেঠা করে। এতে আওয়ামী লীগনেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনসহ প্রায় একশজন আহত হন। হরতালের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ কলেজ ছাত্রীসহ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ফার্মগেট এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পিকেটারদের বাঁধার মুখে পড়েন। হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিনিয়োগ সম্মেলনে বক্তৃতা শেষে ফিরবার পথে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী গাড়ির ১০/১৫ হাত দূরে ২টি হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরিত বোমার ধোঁয়া উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি দ্রুত তাঁর কার্যালয়ের দিকে চলে যায়।

২৪ জানুয়ারী বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির বহরের সামনে হাতবোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ২৬ জানুয়ারী সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ঘটনার দিন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ সম্মেলন উদ্বোধন করে ফিরছিলেন। এর আগে সকাল ৮টা থেকেই আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে ২০০ থেকে ২৫০ জন লোক মিছিল করে হোটেল সোনারগাঁও থেকে বিজয় স্মরণি পর্যন্ত প্রদক্ষিন করছিলেন। ১১টা ৩৪ মিনিটের সময় প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির বহর তেজকুনি পাড়া অতিক্রম করার সময় পূর্ব গলি থেকে হরতালকারীরা একটি বোমা নিক্ষেপ করে। ঐ বোমা বিস্ফোরণে একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার ও একজন কনস্টেবল আহত হয়।

কিন্তু পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করে ঢাকার এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত ২৪ জানুয়ারী হরতালের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোকেরাই প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরের সামনে পটকা ফুটিয়েছে।

২৫ জানুয়ারী সারাদেশে বিরোধী দলের আহবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। দেশে অব্যাহত প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ২৫ জানুয়ারী সরকার দেশে ৪টি সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। সকল বিরোধী দলের বর্জনের ফলে ভোটারবিহীন এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সভায় বলা হয়

Dhaka University Institutional Repository

যে, এ সরকারের অধীনে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় তা উপ-নির্বাচন আবারও প্রমাণ হয়েছে। উপ-নির্বাচনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করায় জনগণ এ নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শতকরা ১০ ভাগ ভোটারও ভোটকেন্দ্রে যায়নি। বিরোধী দলবিহীন এ উপ-নির্বাচনেও সরকারি দল নির্বাচনের দিনে একজনকে হত্যা করেছে।

সভায় আরো বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতালিপ্সাই আজ দেশে গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। সরকার যদি বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চায় তাহলে সংকট আরো বাড়বে, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ।

২৮ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী যান নওয়াবগঞ্জের ভোলাহাটে। সেখানে তিনি বলেন, যথাসময়ে উপযুক্ত সাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনায় তার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

৬ ফেব্রুয়ারী স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধীদলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ পত্র সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন।

পরে স্পীকার সংসদ থেকে পদত্যাগকারী ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে জাতীয় পার্টির এইচ.এম.এরশাদ, এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের দবিরুল ইসলামের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। বাকী ১৪৪ জনের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাখ্যান করেন।

স্পীকার রুলিংয়ে স্পষ্টভাবে মতামত দেন যে, কারণ দর্শানোসহ পদত্যাগ পত্রগুলো গণতন্ত্রের মূল নীতিমালার পরিপন্থী এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতিসমূহের বিরোধী যা সংবিধানের ৬৭(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং আমার অভিমত হচ্ছে, ঐ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৪৪ জনের পদত্যাগপত্র আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। (জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, ২৩/২/৯৫)।

স্পীকারের রুলিং এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংসদ সদস্য পদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ও অটুট থাকবে। বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ আইনসম্মত ও সংবিধানসম্মত। এ কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে শেখ হাসিনা আরো বলেন, পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন না, এ ধরনের কোন এখতিয়ার স্পিকারেই নেই। এ সংক্রান্ত বিষয়ে রুলিং

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া স্পিকারের এখতিয়ার বহির্ভূত। বিরোধী দলীয় সদস্যরা পদত্যাগ করার পর সংসদ এমনিতেই অবৈধ হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, এই পদত্যাগ পত্রের কোন শব্দ স্পীকারের পছন্দ না হলে তিনি তা বাদ দিয়ে পড়তে পারেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে তা উল্লেখ আছে।

১১ মার্চ রাজশাহীতে চেম্বার নেতাদের সাথে এক বৈঠককালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী-এমপিদের ক্ষমতায় আসার আগের ও পরের সম্পত্তি সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে দুর্নীতিবাজ বিএনপি সরকারকে হটানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, আমরা উন্নয়ন ও বিনিয়োগে বাঁধা দিচ্ছি বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবি গ্রুপের ডাকে এবং বিভাগ আন্দোলনের জন্য যে সব হরতাল ধর্মঘট হয়েছে তার দায়িত্ব কি বিরোধী দলের ?

১২ ও ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ডাকে হরতাল পালিত হয়। এই সময় চট্রগ্রামে একজন নিহত হয় ও সারাদেশে ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৩ মার্চ হরতাল চলাকালে বিভিন্ন সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের অধীনে নির্বাচনের ফর্মূলা বাতিল করে বলেছেন, নির্বাচনের তিন মাস আগে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু মানবো না। এই দাবি মেনে নিয়ে ঘোষণা দেয়া ছাড়া রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলেও খালেদা জিয়ার সাথে কোন আলোচনা হবে না।

২৪ মার্চ সার, চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের আহবানে অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

২৬ মার্চ ঢাকায় তিন বিরোধীদলের অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৮ মার্চ ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসার ঠিকানা থেকে একটি কোম্পানীর শেয়ার বিক্রির বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেয়া শুরু হয়েছে। সে কোম্পানীর পরিচালকরা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলে, ভাই ভাবী এবং অন্যরা। কিন্তু কোম্পানীর চেয়ারম্যান কে তা বিজ্ঞাপনে বলা হয়নি। আসলে প্রধানমন্ত্রীই সে কোম্পানীর অঘোষিত চেয়ারম্যান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংবিধান এবং গণতন্ত্র কোনটাই মানেন না। সংসদ থেকে ১৪৭ জন সংসদ সদস্যে পদত্যাগ করার পর এ সরকার অবৈধ হয়ে গেছে। এ সরকার আনসারদের উপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে। অথচ এর জন্য তখন সংসদ থেকে কোনো অনুমোদন নেয়া হয়নি। তিনি পুলিশের উদ্দেশ্য করে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতে পুলিশের রক্ত রয়েছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর ফরহাদকে ছাত্রদল কর্মীরা খুন করেছে।

তিনি বলেন, ন্যায্যমূল্যে সার চাওয়ায় কৃষকদের উপর গুলি করা হয়েছে। শ্রমিকরা তাদের চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করেছে বলে তাদের উপর গুলি করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের টাকায় কেনা গুলি কৃষক-শ্রমিকের উপর চালানো হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কত টাকার গুলি করা হয়েছে জনগণ এর হিসাব চায়।

তিনি আরো বলেন, জিয়াউর রহমান আড়াই হাজার সৈনিককে হত্যা করে গদি রক্ষা করতে পারেননি। এরশাদও জনগনের উপর গুলি চালিয়ে গদি রক্ষা করতে পারেননি, বর্তমান সরকারও পারবে না। তিনি বলেন, বিরোধী দল ঢাকা অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছেন। কিন্তু সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে অবরোধ করেছে।

দেশে ভয়াবহ সার কেলেংকারীর প্রেক্ষাপটে শিল্পমন্ত্রী এম. জহির উদ্দিন খান ৪ এপ্রিল পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ৫ এপ্রিল এই পদত্যাগ ঘটনা প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিল্পমন্ত্রীর পদত্যাগেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রধানমন্ত্রীকেও দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে। এই সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে ভেসেছে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-এমপি ও তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং পদলেহী গোষ্ঠী। অত্যাচারী মন্ত্রী-এমপি দিয়ে দেশের মানুষকে আর জিম্মি করে রাখা যাবে না।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, কৃষক বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও ও দেশ বাঁচাও কর্মসূচি নিয়ে আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দু'টি চিঠি পাঠিয়েছি। আমাদের দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে এ অবস্থা হতো না। চিঠি দু'টি গ্রহণ করা হলেও কোনো উত্তর পাইনি। প্রধানমন্ত্রীও কোন পদক্ষেপ নেননি।

১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ফতুল্লায় এক জনসমাবেশে বলেন, বিরোধী দলগুলো বৈঠকে চটকদারি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে যে, তারা নির্বাচিত হলে জনগণের জন্য অনেক কিছু করবে। কিন্তু তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো যমুনা সেতু নির্মাণ, ঘড় পুকুরিয়ায় কয়লা ও মধ্যপাড়ায় কঠিনশিলা উত্তোলন, মহিলা ও যুবকদের ঋণ সুবিধা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিসহ জনকল্যাণমূলক সকল কর্মসূচি বন্ধ করে দেবে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন খাতে বিএনপি সরকারের গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচির ফলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা বদলেছে। বর্তমানে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, উদীয়মান বাংলাদেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২৮ এপ্রিল বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধী দলগুলোর প্রস্তাব করেছিল যে, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের মতামত নিয়েই প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে কাউকে নিয়োগ করা হোক। কিন্তু এই একতরফা নিয়োগ প্রমাণ করে যে, সরকার নির্বাচনে কারচুপি করতে চায় (রেডিও মনিটরিং রিপোর্ট, রেডিও বাংলাদেশ, ২৮/৪/১৯৯৫)।

কিশোরগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি'র মন্ত্রী-এমপি ও নেতা কর্মীরা নজিরবিহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি করে ধানের শীষকে শুকিয়ে মেরেছে। তিনি শ্লোগান

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বলেন, 'ক্ষুধার জ্বালায় পেটে বিষ, আর নয় ধানের শীষ।' আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, কিশোরগঞ্জে টেক্সটাইল মিল ও কালিয়াচাপড়া সুগার মিলসহ দেশের ৫ হাজার মিল কারখানা বন্ধ করে দিয়ে বিএনপি সরকার দুই লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীকে পথের ভিখারি বানিয়েছে। তিনি বলেন, খাদ্যের দাবি পূরণে ব্যর্থ এ সরকারের আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাই।

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, তিনি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক তথা দেশবাসীকে দেয়া সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। তাঁর কাছে খাদ্যের দাবি জানাতে এসে ক্ষুধার্ত কৃষককে খাদ্যের বদলে বুলেট উপহার দেয়া হয়েছে। সার নিতে এসে ১৮ জন কৃষককে গুলি খেয়ে লাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা অশ্রুসজল চোখে সমবেত জনতার কাছে প্রশ্ন রাখেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও আমি কেন আমার মা, বাবা, ভাইয়ের হত্যার বিচার চাইতে পারবো না ?

অন্যদিকে টাঙ্গাইলে ৬ মে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, যে সব মহল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং উৎপাদন ও উন্নয়ন তৎপরতায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে গর্ভনর পদ্ধতি আবার চালু করবে বলে দেয়া বিবৃতির সমালোচনা করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এর অর্থ ঐ দলটি আবার একদলীয় বাকশাল শাসন কায়েম করবে। তিনি বলেন, এদেশের মানুষ কোনো দিনও কোন মহলকে এক দলীয় শাসনের পুনরুজ্জীবন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী গঠন করতে দেবে না।

৭ মে এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নোংরা মিথ্যায় রাজনীতি শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগ তার গঠনতন্ত্র থেকে অনেক আগেই বাকশাল বাদ দিয়েছে অথচ প্রধানমন্ত্রী জনগণ মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আরো বলেন, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের কথা আছে। কিন্তু বিএনপি'র গঠনতন্ত্রে এখনো রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির কথাই বলা আছে। আওয়ামী লীগই দেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করতে বিএনপিকে বাধ্য করেছে। কারণ বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতি মানতে চায়নি। তিনি আরো বলেন, সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতাবান হয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাদের দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের কায়দায় দেশ চালাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

সবগুলো দল নিয়ে বাকশাল করেছিলেন আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংবিধান লংঘন করে সম্পূর্ণভাবে একদলীয় সংসদ চালাচ্ছেন। তাঁর স্বামী জিয়াউর রহমানও সংবিধান এবং সামরিক বাহিনীর বিধি ভঙ্গ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, বাকশাল বহুদলীয় ছিল বলেই জিয়া এর সদস্য হওয়ার জন্য অনেকের দরজায় ধরনা দিয়েছিলেন।

২০ মে, শনিবার আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ বাধা প্রদান করে। সচিবালয় থেকে একশ গজ দূরত্বে পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা অবস্থান নেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একতরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও তালিকা প্রণয়নের কাজে বিএনপি'র দলীয় লোকদের নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনে কারচুপি করার এবং জনগনের ভোটাধিকার হরনের চক্রান্তের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ এই কর্মসুচি আয়োজন করেছিল।

ঘেরাওয়ের আগে আয়োজিত এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরনের জন্য একতরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিন্দনীয়।

১ জুন বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের পদত্যাগকারী বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে পদত্যাগের অনুরোধ করেন এবং বলেন এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সাক্ষাতের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একতরফাভাবে আপনার নিয়োগ এবং নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে আমরা শুরু থেকেই প্রতিবাদ করে আসছি। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো বারবার বলে আসছে। এমনকি সংসদ ভবনে সরকারের সঙ্গে সংলাপকালেও ঐক্যমত হয়েছিল যে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে। কিন্তু বিচারপতি আব্দুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশন পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর তাড়াহুড়ো করে সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই পদে সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আস্থাভাজন একজন ব্যক্তির অধিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। যা আগেই আলোচনার মাধ্যমে করা সম্ভব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১১ জুন কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, দেশের ১২ কোটি মানুষের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিএনপি সরকার জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই শুধু রক্ষা করছে না, জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকারও নিশ্চিত করেছে। বিরোধী দলের নাম উল্লেখ না করে তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তারা দেশের ৭ কোটি মানুষের দায়িত্ব কাধে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা ১২ কোটি মানুষের দায়িত্ব কিভাবে কাধে নিতে পারে।

২২ জুন ঝুড়িগ্রামে রাজিবপুরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য বিএনপি সরকারকে উৎখাত করতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, খালেদা জিয়া দিল্লীতে বেড়াতে গিয়ে নরসিমা রাওয়ের সাথে আলোচনার পর না বুঝে যুক্ত ইশতেহারে যে সই করেছেন তাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি হয়ে গেছে।

১৬ জুলাই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে একাধিক্রমে ৯০ দিবস অনুপস্থিতির প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টে প্রেসিডেন্টের মতামত চাওয়ার বিষয়টির উপরে শুনানি শুরু হয়।

২৭ জুলাই বিরোধী দলীয় এমপিদের একাদিক্রমে ৯০ দিবস অনুপস্থিতির প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মতামত প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস এর কাছে পেশ করা হয়। ৩১ জুলাই জাতীয় সংসদের ৮৭ জন বিরোধী দলীয় এমপি'র আসন ২০ জুন থেকে শূন্য ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিজি প্রেসে পাঠানো হয়। অবশিষ্ট ৫৫ জন সদস্যের কাছে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি পাঠানো হয়।

৩ আগষ্ট দৈনিক সংবাদ এর একটি খবর প্রকাশ করে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, সংসদ উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীসহ পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারি দল ও বিরোধী দলের ২৯৭ জন সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ গ্রহন করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ বিরোধী দলের ৮ জন সদস্য এ সুযোগ গ্রহন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৯ আগষ্ট নির্বাচন কমিশন বন্যাজনিত কারণে উপ-নির্বাচনের মেয়াদ নির্ধারিত সময় ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ৯০ দিন বৃদ্ধি করে।

১৪ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ২০ বছর উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবসের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, এখন আর অন্যায়ের প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রতিশোধ নিতে হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আরো বলেন, যদি দেখতাম সাধারন মানুষ সুখে শান্তিতে আছে তাহলে আমি রাজনীতিতে আসতাম না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে জন্য নিজের জীবন বিলিয়েছেন। সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হয়েছি। সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, বাস্তবায়ন করব।

১৫ আগষ্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আহবানে সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, রেডিও-টিভিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারসহ অন্যান্য দাবীতে আওয়ামী লীগ এই হরতালের ডাক দেন। এছাড়া শোককে শক্তিতে পরিনত করে জনগনের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, বাস্তবায়নের আহবান জানিয়ে ১৫ আগস্ট মঙ্গলবার সারাদেশে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। ১৯৭৫ সালের এই কালো রাতে স্বাধীনতা ও মানবতার শত্রু নরঘাতকের দল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শোকের এই দিনটিকে জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, সিপিবি, গণফোরামসহ বহু সংগঠন এই শোকাবহ বেদনাবিধুর দিবসটি পালন করে।

২৭ আগস্ট পান্থপথের এক সমাবেশ শেষে নির্বাচন কমিশন অভিমুখী আওয়ামী লীগের শান্তিপূর্ণ মিছিলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র হামলা ও পুলিশের গুলি, লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে রহমান (২৬) নামে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী নিহত এবং দু'শতাধিক আহত হয়। ফার্মগেট এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। সমাবেশ আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর পুলিশ হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। আওয়ামী লীগ দাবি করে তাদের ২ জন কর্মী মারা গেছে। নির্বাচন কমিশনের গৃহীত স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ পূর্ব ঘোষিত পান্থপথে সমাবেশ শেষে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২৭ আগষ্ট ইয়াসমীন নামে এক তরুনীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে পুলিশ দিনাজপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে ৭ জনকে হত্যা করে। এতে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এ ঘটনায় জনতা মারমুখী হয়ে শহরের ৪টি পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশের ৪টি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা দিনাজপুর পুলিশের গোয়েন্দা অফিস জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয়ভাবে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রাত ৯টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শহরে সান্ধ্য আইন জারির কথা ঘোষণা করেন।

২৮ আগষ্ট অশান্ত দিনাজপুরে বিক্ষুব্ধ জনতা সারাদিন খন্ড খন্ড মিছিল, সড়কসমূহে ব্যারিকেড, কাস্টমস গুদাম লুট, সদরের টিএনও'র অফিস ও বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। নিহতদের গায়েবানা জানাযায় হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহন করে। হাজার হাজার মানুষ কোতোয়ালী থানা আক্রমন করতে গেলে পুলিশ ফাঁকাগুলি ছুঁড়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ সুপারকে প্রত্যাহার করা হয় এবং তরুনী ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ৩ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

২৯ আগষ্ট বিক্ষুব্ধ দিনাজপুরে পরিদর্শনে যান শেখ হাসিনা। সেখানে এক সমাবেশে তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন নেই, বিচার নেই, বিচার চাইলে খুন করে মায়ের বুক খালি করা হচ্ছে। খালেদা জিয়াকে খুনি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, পুলিশের হেফাজতে তরুনীর ইজ্জত হরণ করার পর হত্যা করা হয়েছে। এর যদি বিচার না হয় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে ? নেত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবার যেতে হবে। অন্যায় অত্যাচার করে টিকে থাকা যায় না, অতীতেও কেউ টিকে থাকতে পারেনি, মানুষের রক্ত ঝরেছে, এখন তোমার যাওয়ার পালা।

তিনি বলেন, এই সরকার মিথ্যার বেসাতি করে ভূয়া প্রেসনোট দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। প্রেসনোট পড়ে মনে হয় জনগণই যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ভূল করেছে। প্রেসনোটে পুরো মিথ্যার বয়ান দেয়া হয়েছে। তিনি এর ধিক্কার জানিয়ে টিভি এবং রেডিও শোনা থেকে বিরত থাকার আহবান জানান।

১ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র ১৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় এক সমাবেশে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, কেউ যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে চায়, আমরা যে কোনো

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যে তা প্রতিহত করব। যে কোন বিস্তুর বিনিময়ে হলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখব। অন্য কোন প্রক্রিয়াকে কাজ করতে দেয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে আবারো খোলামনে আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, নির্বাচনের ৩০ দিন আগে আমি এবং আমার সরকার ক্ষমতা থেকে সরে যাবে। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে থেকেই সংকট সমাধানের পথ বের করতে হবে। সংবিধানের বাইরে কোনো কিছু হবে না।

২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের খোলা মন দিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ রেখেছেন কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন। খোলা মন নিয়ে আলোচনার যে সুযোগ দিয়েছিলাম তিনি তা গ্রহন করেননি। বরং আমাদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন। আমরা তাকে ভয় পাই না। জীবন বাজি রেখেই আমরা রাজপথে নেমেছি।

এদিকে ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের ডাকে ৩২ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৩২ ঘন্টা হরতাল পরবর্তী জনসভায় বলেন, হত্যাকারী, দুর্নীতিবাজ, ভোট-চোর, সন্ত্রাসী বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোনো অধিকার নেই। তিনি বলেন, অভূতপূর্ব হরতালের মধ্য দিয়ে জনগণ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই অবিলম্বে অবৈধ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে।

৬ সেপ্টেম্বর সংসদ বাতিল ও সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে নির্বাচন, ৩২ ঘন্টা হরতালকালে মিরপুরে হত্যাকান্ড এবং সংসদ অধিবেশন ডাকার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের আহবানে রাজধানী ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এক বিশেষ জাতীয় কাউন্সিলে শেখ হাসিনা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি পুনরুল্লেখ করে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিরোধী দল আহুত লাগাতার ৭২ ঘন্টার হরতাল শুরু হয়। এই সময় অগ্নিসংযোগী লোকদের পিকেটাররা বাঁধা দেন। একটি প্রাইভেট অফিসের

Dhaka University Institutional Repository

একজন কর্মচারীকে জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী আলম কর্তৃক দিগম্বর করার ঘটনা। সারা দেশে আলোড়ন তোলে।

২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিদেশী সংস্থার সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সাথে এক বৈঠকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের সঙ্গে কোনো চুক্তি, সমঝোতা ও লেনদেন না করার জন্য বিদেশী সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ধরনের চুক্তি হবে অবৈধ, কারণ এই সরকার অবৈধ। তাদের চুক্তি করার কোন আইনগত অধিকার নেই।

২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান লংঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করেন। শেখ হাসিনা বলেন, সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংবিধানসম্মত অধিকার, কিন্তু আপনি সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে আজকের সমাবেশে যাতে মানুষ আসতে না পারে সেজন্য বাঁধার সৃষ্টি করে আপনি সংবিধান লংঘন করেছেন। তিনি বলেন সংবিধান লংঘনের দায়ে আমি প্রধানমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করছি। প্রধানমন্ত্রী পদে পদে সংবিধান লংঘন করেন আর মুখে সংবিধান রক্ষার কথা বলেন।

৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকটের একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে পত্রযোগে আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৬ অক্টোবর বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জানান ৯৬ ঘন্টার হরতালের পরও যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নেয়া হয়, তাহলে লোকজন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে অবস্থান ধর্মঘট করবো। যতক্ষণ দাবি আদায় না হবে ততক্ষণ অবস্থান ধর্মঘট চলবে।

৮ অক্টোবর বিভাগীয় সদরে বিরোধী দল আহুত টানা ৩২ ঘন্টার হরতাল শেষ হয়েছে। একদলীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও জাসদ (রব) পৃথক পৃথকভাবে এ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৮ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরাঞ্চলের জনগণ যখন বন্যার পানিতে ভাসছে বিরোধীদল তখন হরতাল পালন করছে। তিনি প্রশ্ন করেন, এটাই কি তাদের জনগণের প্রতি ভালবাসা ? বেগম জিয়া দৃঢ়তার সাথে বলেন, হরতাল দাবি আদায়ের উপায় নয় এবং হরতালের মাধ্যমে দাবি পূরণ হবে না।

১০ অক্টোবর শেখ হাসিনা দিনাজপুরের বন্যাদূর্গত এলাকা পরিদর্শন শেষে একাধিক পথসভায় বলেন, এ সরকার জনগনের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। জনগণের দুর্দশা নিয়ে তারা রাজনীতি শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ থাকেন, টিভি ক্যামেরা যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণই ত্রান দেয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে বিএনপি'র রাজনীতি।

১৪ অক্টোবর ঢাকায় শ্রমিকদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকার মেনে নিলে এখনই হরতাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা একের পর এক প্রস্ত াব দিচ্ছি, কিন্তু কোনটাই সরকারের পছন্দ হচ্ছে না। সর্বশেষ আমরা ৯১ সালের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছি। সে সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত কেউ ছিল না, এবার আমরা প্রস্তাব দিয়েছি, সরকার ও বিরোধী দলের সমান সংখ্যক উপদেষ্টা থাকবেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার বাসভবনের বাইরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার অবস্থান ধর্মঘট করার প্রয়োজন হবে না। আমি আপনাদের সৃষ্ট সমস্যাদির একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য চা খেতে এবং আলোচনা করতে আমার বাসভবনে স্বাগত জানাই, যাতে জাতিকে এরূপ অসুবিধার হাত থেকে মুক্ত করা যায়। তিনি বলেন, বাসভবনের বাইরে রোদের মধ্যে অবস্থান ধর্মঘট করা বরং অস্বাভাবিকই হবে। আমি চাই না আপনারা খোলা আকাশের নিচে বসে কষ্ট করুন।

১৪ অক্টোবর এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, রাজনৈতিক সমস্যা বিরোধী দলের সৃষ্ট নয় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই সংকটের সৃষ্টি করেছেন। লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়ে সংকটের বিস্তার ঘটিয়েছেন। নিজের সংকটে নিজেই আটকা পড়েছেন। তাই ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, জনগনের ভোটদান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেন কেড়ে নিতে

Dhaka University Institutional Repository

চান প্রধানমন্ত্রী ? আমরা হরতাল করতে চাইনি, প্রধানমন্ত্রীই আমাদের হরতাল করার জন্য বাধ্য করেছেন।

১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয় দেশের প্রথম একটানা ৯৬ ঘন্টার হরতাল। এতে প্রথম দিনেই নিহত হন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক ছাত্রনেতা শাহনেওয়াজ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিহত এই ছাত্রলীগ নেতা শাহনেওয়াজের লাশ সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ দিন বলেছেন, আমরা এই হত্যার প্রতিশোধ নেবো, হত্যাকারীরা রেহাই পাবে না। তিনি এই হত্যার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে বলেন, এই খুনি সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এক দফার আন্দোলন শুরু হলো।

অবশেষে বিরোধী দলের দাবির মুখে ১৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে ১১ সদস্যের। ৫ জন থাকবেন সরকারি দলের ও ৫ জন থাকবেন বিরোধী দলের, এছাড়া প্রধানমন্ত্রী যিনি হবেন, তিনি (বেগম জিয়ার) মনোনীত হবেন। বিরোধী দলের ৫ জনকে উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে।

২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি চিঠি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী সঙ্কট নিরসনে খোলামনে আলোচনার জন্য শেখ হাসিনাকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রন জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে উল্লেখ ছিল না। ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রামের উন্নয়নে সরকারের অবহেলা, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকান্ডে অসহযোগিতা ও পদে পদে বাঁধা সৃষ্টির অভিযোগ করে আয়োজিত এক জনসভায় সিটি মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৮ দফা দাবি উত্থাপন করে বলেন, ১৬ ডিসেম্বর মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চিঠির তড়িত উত্তর পাঠান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আলোচনার সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী আলোচ্যসূচিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি আবারও এড়িয়ে যান এবং চট্টগ্রামে এক সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে অন্যায় ও অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে এই দাবিতে যারা হরতাল অবরোধের কর্মসূচি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগনের প্রতি আহবান জানায়। তিনি বলেন, দাবিটি নীতিগতভাবে আমি মেনে নিতে পারি না। সুতরাং আর আলোচনা কিসের?

তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছাড়া কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ নিরপেক্ষ লোক বলে কেউ নেই। তারা বললেই কাউকে এনে আমি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সাথে সাম্প্রতিক চিঠি চালাচালি প্রসঙ্গে বলেন, ক'জন সিনিয়র সাংবাদিক আমার সাথে দেখা করে বললেন, আপনি বিরোধী দলীয় নেত্রীকে একটা চিঠি লিখতে পারেন কিনা। আমি বললাম, কেন পারব না। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা তাদের ভাষায় চিঠি লিখিনি। যাতে তারা বলতে না পারেন যে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও আমরা সংযত ভাষায় আরেকটি জবাব দিয়েছি। তারা বলছে এজেন্ডার কথা। আমাদের চিঠিতে এজেন্ডার উল্লেখ করা আছে। আমরা তাদের বলছি আসুন, সংসদ নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তাতে আপনাদের কি সুপারিশ রয়েছে আসুন বসে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছি। কিন্তু তাঁরা গোঁ ধরে বসে আছেন। এজেন্ডা ছাড়া এগুচ্ছেন না।

৪ নভেম্বর শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাবে আর একটি চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে আলোচনার জন্য সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি দাবি করেন।

৬ নভেম্বর বিরোধী দলের আহ্বানে বিভিন্ন দাবিতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধ পালিত হয়।

৭ নভেম্বর বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে।

৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালে বিক্ষোভকারীদের তাড়া করতে গিয়ে পুলিশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৩য় তলা পর্যন্ত বেপরোয়া হামলা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

১১ নভেম্বর সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ ও সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে বিরোধী দল আহুত ৬ দিনের হরতাল শুরু হয়।

১২ নভেম্বর হরতালের দ্বিতীয় দিনে ঢাকায় অর্ধশত আহত এবং ৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পত্রের জবাবে আবারও তত্ত্বাবধায়ক শব্দ লেখা থেকে বিরত থাকেন। ফলে চিঠি চালাচালির রাজনীতিতে মূল সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হয়নি।

১৩ নভেম্বর হরতালের তৃতীয় দিনে পুলিশের সাথে আওয়ামী কর্মীদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যায়। এই সময় মতিয়া চৌধুরীসহ আরো অনেক কেন্দ্রীয় নেতা পুলিশের হামলার আহত হয়।

২১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হয়। ২৩ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৫ ডিসেম্বর সংসদের ১৪৬ টি শূন্য আসনে উপ-নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।

২৪ নভেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী বেগম বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদ ভেঙ্গে দেন। একই তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টিভি ভাষণে সকল দলকে আহবান জানিয়ে বলেন, আসুন সবাই মিলে আসন্ন নির্বাচন সফল করি।

২৬ নভেম্বর শেখ হাসিনা এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সরাসরি টেলিফোন করেন কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে প্রত্যাখ্যান হন। তাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেয়া যাবে না এবং সংবিধানের বাইরে যাবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা টেলিফোনে খালেদা জিয়াকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ ও জাতিকে এই সংকট থেকে তিনিই মুক্ত করতে পারেন। আশাবরি আপনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে উদারতা দেখাবেন এবং এ জন্য ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

২৬ নভেম্বর রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আবার ও চিঠি চালাচালির একটি ঘটনা ঘটে। এদিন বিরোধী দলীয় নেত্রীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি একে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। পরে শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবটিও কার্যে পরিনত করার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান।

২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের টাকা দলীয় নির্বাচনের প্রচারণায় অবাধে ব্যবহার করছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের ইচ্ছে মাফিক বদলি করা হচ্ছে নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ সৃষ্টির জন্য।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন আর সংসদ নেত্রী নন। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতির অনুরোধে। সরকারি প্রচার মাধ্যম, রেডিও-টেলিভিশন, সরকারি সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সরকারি টাকায় চলে। প্রধানমন্ত্রী সেগুলো দলীয় কাজে ব্যবহার করছেন। প্রশাসনকেও দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষমতা অপব্যবহার করে জনগনের টাকা দলীয় নির্বাচনের কাজে ব্যয় করার কোন অধিকার তার নেই।

৩ ডিসেম্বর, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারেন। সংবিধানের ৪৮ (২) এবং ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করতে পারেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না করেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল (২ ডিসেম্বর) রোববার প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেলাম। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করে নির্বাচন ঘোষণা করা আর দোযখের আগুনে পোড়া একই কথা।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা দেয়।

৭ ডিসেম্বর, প্রধানমন্ত্রীর অফিস অভিমুখে বিরোধী দলের মিছিলকে কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগরীতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শতাধিক আহত হয় এবং প্রায় ৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

৮ ডিসেম্বর পান্থপথে শেখ হাসিনার বক্তৃতাকালে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও বোমা হামলায় শতাধিক লোক আহত হয়।

৯ ডিসেম্বর বিরোধী দল আহুত রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ৭২ ঘন্টার হরতাল শুরু হয়। বিদায়ী বছরে ৪১টি হরতাল হয়েছে। গত ২৫ বছরে ৯৫ সালেই সর্বাধিক সংখ্যক হরতাল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান মিলিয়ে ১৭১ টি হরতাল হয়েছে। ৯৪ সালে আঞ্চলিকসহ ছোট বড় ৭৪টি হরতাল ডাকা হয়।

গত বছর তিনদল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর অভিন্ন ডাকে রাজধানীসহ দেশব্যাপী ৩৪টি হরতাল ডাকা হয়।

দৈনিক সংবাদের মতে, ১৯৯৫ সাল ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনীতির ফর্মূলার বছর।

৫.৪ ১৫ ফেব্রুয়ারীর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলন এবং রদ্দ প্রত্যাশিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস ঃ

তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলন ১৯৯৬ সালের শুরুতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। খালেদা জিয়ার সরকার এই সময় দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনে সেনাবাহিনী তলব করে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, অবৈধ অস্ত্রধারীদের তান্ডবলীলায় দেশবাসী আজ আতঙ্কগ্রস্ত। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। হত্যা, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি প্রতিনিয়ত ঘটছে। ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষও সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। এমনি এক মুহূর্তে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছি যে, আজ সোমবার থেকে প্রতি জেলায় ও থানায় সশস্ত্র বাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া এ সেনাবাহিনী অতীতে ব্যক্তি বিশেষের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ও সৈনিককে জীবন হারাতে হয়েছে।

বারবার ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে জনগণের বিপক্ষ শক্তি হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীকে দাঁড় করাবার যে প্রক্রিয়া চলেছিল তার বিরুদ্ধে আমরা সবসময় প্রতিবাদ করেছি।

বিএনপি সরকার বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি উপেক্ষা করে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহন করে। এর প্রতিবাদে ৩ জানুয়ারী ঢাকায় এক জনসভায় বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য বলেন সংসদ ভাঙ্গার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে একবার অনুরোধ করে দেশ পরিচালনা করতে বলেছেন। তিনি এখন আর সংসদ সদস্য নন। আরেকবার তাকে অনুরোধ করুন, যাতে তিনি পদত্যাগ করে জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে রেহাই দেন। শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন রোজার মাসে আন্দোলন হবে না। তিনি ইচ্ছামত ভোট চুরি করে একদলীয় নির্বাচন করিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে, রোজার মাসেও যুদ্ধ হয়েছিল।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে আরো বলেন, আপনাকেও বলছি পদত্যাগ করে জাতিকে রেহাই দিন। তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, একদলীয় কোন নীলনকশার নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে কোন মূল্যে আপনারা নীলনকশার নির্বাচন প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিন। গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়-মহল্লায় মানুষের কাছে যান। তাদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য পাশে গিয়ে দাড়ান।

Dhaka University Institutional Repository

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি একা হয়ে যায়। এদিকে ৫ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ নেতা আনির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ এবং মোহাম্মদ নাসিম রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে দেখা করে অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পদত্যাগের মধ্যস্থতা করতে আহ্বান জানান। কিন্তু জনাব বিশ্বাস এ ব্যাপারে তার অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। এদিন বিভিন্ন আসনে বিএনপি'র প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দলীয় কোন্দলের জের হিসেবে সরকারী দলের বিক্ষুব্ধ অংশ বিরোধীদলের স্টাইলে হরতাল, সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘট পালন শুরু করে।

৮ জানুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ১৫ ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হয়। এদিক ৮ ও ৯ জানুয়ারী বিরোধী দলের ডাকে ৪৮ ঘন্টার হরতালে সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। ঢাকায় প্রথম দিন সেনা সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে হরতালের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে গেলে আওয়ামী লীগের নেতা মতিয়া চৌধুরী প্রতিবাদ করেন। একজন সেনা অফিসার এদিন একজন ফটোসাংবাদিকের ক্যামেরা ও ফিল্ম পর্যন্ত কেড়ে নেয়।

ঢাকায় বিরোধী দলগুলো ১০ জানুয়ারী সমাবেশে করে ১৭ জানুয়ারী পুনরায় হরতাল আহ্বান করে। এদিন পান্থপথে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ভোট চুরি করে বিএনপি আবার ক্ষমতাসীন হবে তার বৈধতা দেয়ার জন্য ফোন প্রহসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাবে না, বরং অবাধ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করে যাবো। তাতে যত বছরই লাগুক না কেন।

১৬ জানুয়ারী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সারাদেশ থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের এক মহাসমাবেশে বিএনপি'র একতরফা নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানান।

১৬ জানুয়ারী সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টায় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভেভিড এন মেরিলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ হাইকমিশনার পিটার জে কাউলার, কানাডার হাই কমিশনার জন জে স্কট, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োসিকাজু কানেকো, অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার কেনেথ উইলিয়াম এসপিনাল এবং ইতালির রাষ্ট্রদূত রাফায়েল মিনিয়েরো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সাথে লাগাতার বৈঠক করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের ১৭ জানুয়ারী রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা তারিখ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ঔদিন বিএনপি'র সরকারের একগুয়েমির ফলশ্রুতিতে একটি একতরফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া হয়। সারাদেশে এদিন বিএনপি'র রাজনৈতিক খেলা হয়, অর্থাৎ একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি'র মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোথাও পাতানো প্রার্থী, কোথাও বিদ্রোহী প্রার্থী ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে।

পূর্বেই বিরোধী দলগুলো এদিন হরতাল ডেকেছিল। শেখ হাসিনা এদিন এক বিবৃতিতে এই প্রহসনমূলক নির্বাচনের পরিনতির দায়-দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই বহন করতে হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এদিন নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ ফার্মগেট এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিলে সাড়াশি আক্রমন চালালে অর্ধশতাধিক নেতা কর্মী আহত হয়। এদিন মতিয়া চৌধুরী পুলিশ কর্তৃক নাজেহাল হন।

বিরোধী দলগুলো এক যৌথ ঘোষণার বিএনপি সরকারের পতন ঘটানোর প্রত্যয় ঘোষণার সাথে প্রধান নির্বাচন কমিশন বিচারপতি সাদেকেরও পদত্যাগ দাবি করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট নিরসনে নিদর্লীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জাতীয় দাবি না মেনে বিএনপি সরকার একতরফাভাবে যে প্রহসনমূলক নির্বাচনের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১৯ জানুয়ারী এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছরের লড়াই-সংগ্রাম ও শত শহীদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিদর্লীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট প্রদানের যে অধিকার অর্জন করেছিল বর্তমান বেগম খালেদা জিয়ার সরকার তাও কেড়ে নিচ্ছে। জাতীয় সংসদ শতকরা ৬৯ ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসহ সকল বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে এবং সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছাকে পদদলিত

Dhaka University Institutional Repository

করে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা লিপ্সা ও একগুয়েমি আজ দেশকে সংঘর্ষ, সংঘাত ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শেখ হাসিনা একদলীয় নির্বাচনে শ্রেণী পেশাসহ সর্বস্তরের জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহন হতে বিরত থাকা এবং নির্বাচনী যে কোন রকম কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিরোধী দল আহুত সর্বাত্মক হরতালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীর কড়া প্রহরায় দুটি মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।

বিরোধীরা যদিও প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফর ঠেকাতে পারেনি তবুও নির্বাচনী প্রচারণার এটা খুব শুভ সূচনা নয়। তাছাড়া প্রধান বিরোধীদলগুলো আভাস দিয়েছে যে, আগামী তিনি সপ্তাহে বেগম খালেদা জিয়া যে শহরের যাবেন সে শহরেই হরতাল ডাকা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পুনরায় আহবান জানিয়ে বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, গণবিচ্ছিন্ন, সরকার গদি রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে। কারো অবৈধ ক্ষমতা ও একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা মেনে নেয়া যায় না।

৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, শ্রমজীবি, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মত বিনিময় সভায় ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনকে একদলীয়, প্রহসনমূলক ও গণতন্ত্র হত্যার নীল নকশা হিসেবে চিহ্নিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে ও স্ব স্ব অবস্থান থেকে এই নির্বাচন বর্জন, প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার সর্বসম্মত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে দেশ, জাতি, সংবিধান, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় তা যেকোন মূল্যে বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্য ১২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী পেশার সংগঠনগুলোর বৃহত্তম সমাবেশ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বন্ধে দেশের সবশ্রেণী সচেতন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি এই নির্বাচনী তামাশায় যুক্ত না হওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানানোর পাশাপাশি হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর পাহারা চিরদিনের জন্য থাকবে না। জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করলে জনগণও সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবে। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে সহযোগিতা না দিলে ক্ষমতাসীন সরকার সেগুলো ভেঙ্গে দিবে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন কোন সরকার এ ধরনের হুমকি দিতে পারে না। নির্বাচনের নামে প্রহসন করার জন্য এই সরকার সকল সীমা লংঘন করছে।

৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রহসনের নির্বাচন বন্ধ, চরম দুর্নীতিবাজ খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের পতন ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অর্থবহ নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন- জনগণ যে নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে না, রাজনৈতিক দলগুলো যে নির্বাচন বর্জন করেছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছে, সেই একদলীয় নীলনকশার নির্বাচনী প্রহসন এদেশের মাটিতে হতে দেওয়া হবে না।

১০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে গণমিছিল এবং ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ৪৮ ঘন্টা লাগাতার হরতালসহ ৬ দিনের টানা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের দিন ৬৮ হাজার গ্রামে জনগণের কার্ফু থাকবে। তিনি ঐদিন ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি নির্বাচন সামগ্রী পরিবহন না করার জন্য পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানান। একই সঙ্গে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন না করা এবং টেলিভিশন ও রেডিওর কলা-কুশলীদের নির্বাচনী ফলাফল প্রচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন না নেওয়ার জন্য আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

নদীর পানি বহুদূরে গড়িয়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার টনক নড়ে। ৩ মার্চ রোববার জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ৩ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, (১) ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এই সরকার দৈনন্দিন সরকারি কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করবেন, কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। (২) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনী বিল আনবো। যত শিগগির সম্ভব এই সংশোধনী বিল সংসদে পাস করানো এবং সংবিধান অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে। (৩) অতঃপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪ মার্চ বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করায় খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানান।

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) সালের এই একতরফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারী দল বিএনপিতেও বিদ্রোহ দেখা যায়। দলের একজন সাবেক এমপি এই নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরগুনা থেকে এই বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম মনি ৭ ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান। তিনি বিরোধী দলীয় চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অবিলম্বে প্রহসনের নির্বাচন বন্ধ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আহবান জানান।

বিবিসি'র সংবাদদাতা রিচার্ড গ্যালপিন তার রিপোর্টে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সর্বশেষ পর্যায়ে গতকাল রাজশাহী যান। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাকর। এ সফরের আগে সরকারি ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়। আহত হয় আরো অনেকে। আর যে প্রধান বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জন করেছে তারা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটানোর লক্ষ্যে শহরে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা চালায়।

প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার পথে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পথের কয়েক শ'গজ দূরে বোমার আঘাতে একজন পুলিশ মারা যায়। পুলিশ এর

Dhaka University Institutional Repository

জবাবে গুলি চালায়। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠে।

সহিংসতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে ভাষণ দেন, যদিও সমাবেশ খুব একটা বেশি লোক হয়নি, হয়তো বা কয়েক হাজার লোক মাত্র। সমাবেশস্থলের এক সিকিও ভরেনি।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য বিরোধী পক্ষের সমালোচনা করেন। তিনি বিরোধীদলগুলোর বিরুদ্ধেও জনগনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে ভয় পাচ্ছে। কারণ তারা জানে যে, তারা পরাজিত হবে। বিরোধী দলগুলোর বর্জন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আরো একবার জনগণের প্রতি ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এই কথা প্রমান করতে যে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ৮ ফেব্রুয়ারী লালবাগে আওয়ামী লীগ নেতা ও ওয়ার্ড কমিশনার হাজী আলিমকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারী এর প্রতিবাদে সমগ্র লালবাগে বলা চলে সারাদিন যুদ্ধ চলে। আলিমের শোক মিছিলেও হামলা করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারী নীলনক্ষার নির্বাচন বন্ধ করা, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগসহ ৮ দফা দাবীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, বিএনপি সরকারের সীমাহীন ক্ষমতা লিপ্সার কারণে সারাদেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে দেশে অচিরেই গৃহযুদ্ধ দেখা দিবে।

১১ ফেব্রুয়ারী বিবিসি এক চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করে জানায় যে, দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা তাদের প্রচার অভিযান বাদ দিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রার্থী তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর ও জয়পুরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকেই প্রাণ ও মানসম্মানের ভয়ে নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে পালিয়ে ঢাকা কিংবা অন্যান্য জেলায় আত্মগোপন করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এক বলংকজনক ঘটনা ঘটায় বিএনপি। ১৯৯৮ সালে সামরিক সরকার এরশাদ ভোট চুরিতে যে অপকর্ম করেছিল ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তাকেও ছাড়িয়ে যায় খালেদা জিয়ার সরকার। এই সম্পর্কে বিবিসি যে ভাষ্য প্রচার করে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকার মতো। বিবিসি বলে ঃ

শুক্রবার বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অক্ষিসন্ধে অপসারণ, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা না করা ও এক্ষুনি নিদর্লীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন দেওয়ার দাবিতে ঈদের পর তিন দিন সর্বাত্মক অসহযোগিতা তথা ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলো থেকে বলা যায় যে, এই কর্মসূচি পালিত হবে ঠিকই। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি আর অজানা অচেনা কিছু দলের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে যে সাধারণ নির্বাচন হলো তাতে বিএনপি যে একচেটিয়া আসন পাবে তা সবার জানা ছিল। কিন্তু যা দেখে নিজের চোখ কানের উপর বিশ্বাস নষ্ট করতে হচ্ছে তা হলো বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে যে বিপুল সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি ঘোষণা হচ্ছে সেটা। এই শহরে যতগুলো ভোট কেন্দ্রে গেছি, সহকর্মীদের কাছ থেকে অন্য যেগুলোর খবর পেয়েছি আর সংবাদপত্রে যে ফটো ছবি দেখেছি তাতে পরিস্কার ভাবেই বুঝেছি যে, নগণ্য সংখ্যক ভোটারই সেদিন ভোট কেন্দ্রে এসেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি, এই ঢাকাতেই দু'জন বিএনপি নেতা প্রত্যেকেই এক লাখের উপর ভোট পেয়ে বসে আছে। আর লক্ষ ছুঁই ছুঁই সংখ্যা দেখানো হয়েছে আরো কয়েক জনের বেলায়।

খোদ নির্বাচন কমিশনই এতে হতভম্ব হয়ে গিয়ে এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর সাফল্যের রহস্যটি কোথায় তা তারা খতিয়ে দেখবে। এখন যে ফলাফল আসছে তা বলা হয় অনানুষ্ঠানিক। ভোট চুরি বা ভোট ডাকাতি হয়েছে এমন সন্দেহ আছে যে সব ক্ষেত্রে সে সব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা বন্ধ রেখে শক্তভাবে তদন্ত করা। আর সেই কাজটি পারবে কিনা নির্বাচন কমিশন এখন সেই পরীক্ষারই মুখোমুখি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁকা মাঠে গোল করার সুযোগ পেয়েও বাড়াবাড়ি করে বিএনপি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে – একথা বলছেন আজকেই কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু।

১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনকে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করে। ১৭ ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫ জন শিক্ষক এক বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১ জন শিক্ষকও অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেন। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ৮ জন আইনজীবীও নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে ১৭ ফেব্রুয়ারী বিবৃতি প্রদান করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কড়া বিবৃতি প্রদান করে ওয়াকার্স পার্টি। তারা বলে, তারা বিএনপি সরকারের পদত্যাগ নয়, অপসারণ করার জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাবেন। তারা বলেন, গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পথে এই সরকার উৎখাত হবে।

বিএনপি আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর একতরফা নির্বাচন যে কতোটা অসার হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ মেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা দেখে। মোট ৪৩ জন প্রার্থী ৪৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার মতো 'ম্যানেজ' অবস্থার সৃষ্টি করে, কোন কোন আসনে প্রার্থীও পাওয়া যায়নি। ঐ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল ৪৩টি দল ও জোটের ১শ' ১৪জন প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৪টি আসনের ফলাফল নির্ধারিত হওয়ায় প্রার্থী হচ্ছেন ১৪শ' ৭০ জন।

শেখ হাসিনার নয় দফা ঃ

এর আগেই ১৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে নেয়ার আহবান জানিয়ে নয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ঃ

১) এখন থেকে প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পরিচালিত হবে।

২) বেসামরিক প্রশাসন রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সচিবদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৩) টিএনও, ডিসি, কমিশনার, এসপি ও পুলিশ কমিশনার থানা, জেলা ও বিভাগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নির্দেশ অনুসরণ করবেন।

৪) তিন বাহিনী প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সকল সচিকাণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সরকার পরিচালনা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫) বিএনপি সরকারের অনুপস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় জনগণ এবং সকল রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসনকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা করবেন যেন দেশে কোনো সঙ্কট সৃষ্টি না হয়।

এই পরিস্থিতির মাঝেই আসে ১৯৯৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। ১৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমনের প্রতিবাদে একুশ উদ্‌যাপন কমিটির সাথে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করে ১৮ ফেব্রুয়ারী দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিককর্মীরা বিরোধী দল ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে বলে, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত বিরোধী দল ক্ষমতাসীন বিএনপি ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে, কোন ভোট ডাকাত, গণতন্ত্র হত্যাকারী নতুন করে এদেশে সংসদ ভবনকে কলঙ্কিত করবে তা হতে দেয়া হবে না। অবৈধ কোন সংসদের অধিবেশন বসতে দেয়া হবে না। এজন্য আরো রক্ত দিতে হলে, আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও আমরা প্রস্তুত। এদিকে বিরোধী দলগুলো বিএনপি সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে এ অসহযোগ কর্মসূচি শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী দেশের সকল সরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশ পথ বন্ধ থাকে। এর মধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে বিরোধী দলের সমাবেশে সশস্ত্র গুন্ডারা গুলী চালালে ৪০ জন আহত হয়। ঢাকায় এদিন মতিয়া চৌধুরী, মোহম্মদ নাসিম ও মওদুদ আহমদসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী তোফায়েল আহমদকেও গ্রেফতার করা হয়। এর আগে জাতীয় পার্টির নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও গ্রেফতার হন। ২৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হলে বন্দর নগরী অচল হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারী এক সরকারী প্রেসনোটে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে যথাযথ সময়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। যানবাহন মালিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, হরতালে কোন যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার তার ক্ষতিপূরণ দিবে। (সরকারী প্রেসনোট, পিআইডি, ঢাকা ২৩.০২.১৯৯৬)

১ মার্চ থেকে বিএনপি সরকার সাংবাদিকদেরও গ্রেফতার করতে শুরু করে। এদিন 'আজকের কাগজ' দৈনিকের প্রধান প্রতিবেদক সৈয়দ বোরহান কবীরকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায়।

এদিকে ২ ফেব্রুয়ারী বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের এক স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, খালেদা জিয়ার অবৈধ বিএনপি সরকার ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রহসনমূলক নির্বাচনকে ঘিরে এ পর্যন্ত ৪১ ব্যক্তির প্রাণ নিয়েছে, সারাদেশে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার সরকারকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে বলেন, আলোচনা হতে হবে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে। এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন? এই প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, সাংবিধানিকভাবে আমার ক্ষমতা নেই, তবে কেউ উদ্যোগ নেয়ার কথা বললে শুনতে ভাল লাগে। আমার ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার নেই। সংসদীয় পদ্ধতিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা আছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সেই ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেই একথা শুনতে খারাপ লাগে।

Dhaka University Institutional Repository

এরই মধ্যে ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী নেতা শেখ হাসিনার কাছে একটি পত্র পাঠান। এতে তিনি বলেন,

তারিখ ঃ ৫ মার্চ ১৯৯৬

মিসেস শেখ হাসিনা ওয়াজেদ
সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

প্রিয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী
আসসালামু আলাইকুম,

গত ৩ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ভবিষ্যতে যাতে সকল জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সব নির্বাচনে যাতে দেশের সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করতে পারে — সেই লক্ষ্যে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি।

এইসব প্রস্তাবকে আলোচ্যসূচি হিসেবে বিবেচনা করে নির্দলীয় সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে আমি অবিলম্বে আপনাদের প্রতি আলোচনায় বসার আহবান জানাচ্ছি।

যতশীঘ্র সম্ভব, কবে এবং কোথায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় বসতে পারি সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত আমাদেরকে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশাকরি যে, ইনশাআল্লাহ, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আলোচনার মাধ্যমেই বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে।

আল্লাহ হাফেজ।

ভবদীয়
বেগম খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

Dhaka University Institutional Repository

৭ মার্চ শেখ হাসিনা ৫ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন,

১) আগামী ৯ মার্চের মধ্যে সকল বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে।

২) প্রহসনমূলক পুনর্নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া এই মুহূর্ত থেকে বন্ধ ঘোষণা করতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারীর একদলীয় প্রহসনমূলক নির্বাচন বাতিল করতে হবে এবং সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

৩) আগামী ১০ মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং আগামী মে মাসের মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

৪) প্রহসনমূলক নির্বাচন করতে গিয়ে এবং সরকারি সন্ত্রাস ও নির্যাতনে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষের জানমালের যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে।

১০ মার্চ রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠককালে শেখ হাসিনা তার দাবি উত্থাপন করেন। রাষ্ট্রপতি একই দিন জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামী, বামফ্রন্টের রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, গণফোরামের ড. কামাল হোসেন প্রমুখের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সকল দলই ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বাতিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেন। ১১ মার্চ রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস বিএনপি'র সাথেও বৈঠক করেন।

অনেক আলোচনার পরে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস অবশেষে রণে ভঙ্গ দেন। বিএনপি থেকে তাকে বিশেষ কোন বিপ্লবী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। ১৫ মার্চ জনাব বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার ক্ষমতা সীমিত।

রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের আকস্মিক রণ-ভঙ্গ বিবৃতির কঠোর জবাব দেন বিরোধী দলের নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৬ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাষ্ট্রপতির বিবৃতিকে বিএনপি'র স্বার্থ রক্ষার জন্য বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের মতামতেরই প্রতিধ্বনি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির বিবৃতিকে সংকট সমাধানের পরিবর্তে দেশকে নৈরাজ্য, সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ার ইঙ্গিত বলেও অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সবচেয়ে উদ্বেগ ও শংকার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ১৫ ফেব্রুয়ারীর ব্যাপক ভোট চুরি ও প্রহসনের নির্বাচন, যা ইতিমধ্যেই জাতি প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই নির্বাচনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, বিএনপি'র স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি জনমতের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, জনগণের ভোট চুরি করে সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদ লংঘন করেছেন। বিএনপি যে অন্যায় করছে সেই অন্যায়কে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করার কৌশল গ্রহণ করেছেন।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, দেশবাসী লক্ষ্য করেছেন যে জনগণের আন্দোলনের প্রতি কোন প্রকার স্বীকৃতি, সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে রাষ্ট্রপতি জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশৃঙ্খলা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে বিএনপি'র স্বার্থ রক্ষার জন্য বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের মতামতেরই প্রতিধ্বনি ব্যক্ত করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে আমি আবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, আওয়ামী লীগ এদেশের জনমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রাম গত চার দশক যাবৎ যেভাবে করেছে এখনও সেভাবেই চালিয়ে যাবে। আমরা জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে তুলে দিয়ে সাংবিধানিকভাবে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এদিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯ মার্চ বিতর্কিত সংসদ ডাকার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, রাষ্ট্রপতি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। রাষ্ট্রের কথা, জনগণের দাবি ও মতামতকে উপেক্ষা করে ও সংবিধান লংঘন করে রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর সাথে প্রতারণা করেছেন, দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ভূমিকা পালন না করে রাষ্ট্রপতি বিএনপি'র হীনস্বার্থের রক্ষক ও আজ্ঞাবাহী হিসেবে কাজ করেছেন বলে মত ব্যক্ত করার পাশাপাশি শেখ হাসিনা ১৯ মার্চকে জাতীয় জীবনে 'কলঙ্কময় দিন' চিহ্নিত করে ঐ দিনকে 'কালো দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একই সাথে তিনি ঐ দিন সংসদ বসানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড় তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ ১৯ মার্চের 'তথাকথিত' সংসদ অধিবেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বর্জনের জন্য ঢাকায় অবস্থিত সকল দূতাবাস, দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানায়।

এই সংবাদের মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যত এক অনিশ্চয়তার দিকে যাত্রা করে। একটা আশংকায় নাগরিক জীবন সন্ত্রস্ত হতে থাকে।

১৯ মার্চ বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। এদিকে সংসদ ঘেরাও কর্মসূচি শুরুর আগে বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অবৈধ সংসদ বাতিল করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে আগুন জ্বলবে। তিনি 'অবৈধ সরকারকে' প্রতিহত করতে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সংবিধানের ৭১ ধারা লংঘন করে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিয়ে জনগণকে অপমানিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ জনগণ মানবে না। তিনি 'অবৈধ সরকারের' মন্ত্রী-এমপিদের চিহ্নিত করার আহ্বান জানিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা তাদের চিনে রাখুন। যাকে যেখানে পাবেন শাস্তি দিবেন।' তাদেরকে রক্ষা না করার জন্য পুলিশ বিডিআরদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ভোট চোরদের রক্ষা করবেন না, তাহলে জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। এর আগেই দেশজুড়ে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী, ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে শপথ নেয়। রাষ্ট্রপতি প্রথমে বর্তমান সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বঙ্গভবনের দরবার হলে অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এ শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

২০ মার্চ দেশে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। সরকার বিরোধী দলের লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সেনাবাহিনীই এই পর্যায়ে সরকারের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে। বিএনপি সরকার এদিন এক প্রেসনোটে বলে ঃ

'সরকার উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মহলের বে-আইনী ও সহিংস তৎপরতার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতায় ফলে যোগাযোগ, ব্যবসা, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য এবং শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। বিভিন্ন স্থানে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টি জনগণের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। এতে বলা হয়, জনগণের দরিদ্র অংশ বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

প্রেসনোটে আরো বলা হয়, এ পরিস্থিতিতে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (সরকারী প্রেসনোট, পিআইডি, ২০ মার্চ, ১৯৯৬) ২৩ মার্চ থেকে সরকার বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এদিন থেকে প্রহসনের নির্বাচন ও অবৈধ সংসদ বাতিল, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিকেল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা ও সচিবালয় ঘিরে ঢাকার মেয়র মোহম্মদ হানিফের নেতৃত্বে অবিরাম অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। মেয়র হানিফ ঘোষণা করেছেন, অবৈধ খালেদা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিন ধরে অবস্থান ধর্মঘট চলবে। তিনি এ ব্যাপারে ঢাকার ৮৬ লাখ মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৫ মার্চ সকাল থেকে সচিবালয়ে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে সবগুলো ভবনের লিফট বন্ধ হওয়ায় সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পায়ে হেঁটে নেমে সমাবেশে যোগ দেন। চারজন সচিব আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

২৭ মার্চ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ৩৫ জন সচিব দেখা করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারি অফিসসহ সারাদেশ থেকে খবর আসতে থাকে যে, সর্বত্র সরকারি অফিস থেকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি অপসারণ শুরু হয়। সচিবালয়ের সেনাবাহিনী প্রবেশ করলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বলা চলে বিস্ফোরণই ঘটে। এর ফলে প্রশাসন সমূলে ভেঙ্গে পড়ে। একযোগে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে জনতার মঞ্চে যোগ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঢাকার বাইরে রাজশাহী, সিলেট, নরসিংদী, মৌলভী বাজার, সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 'জনতার মঞ্চ' স্থাপন করা হয়। প্রতিটি মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয়, অবৈধ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত মঞ্চ থেকেই বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস ঃ

২৭ মার্চ ভোররাতে বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (ত্রয়োদশ সংশোধনী) বিল জাতীয় সংসদে পাস করে। রাত পৌনে ৪ টায় কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং নয়া অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করার মাধ্যমে গণভোট এড়ানো হয়। ফলে রাষ্ট্রপতিকে এই সংশোধনী বিলে সম্মতি দিতে আর গণভোটের প্রয়োজন হয়নি। রাত ১১টা ৫০ মিনিটে বিলটি পাসের প্রক্রিয়া শুরু হলেও নানা ভুলত্রুটি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষ্যে অসঙ্গতি, গণভোট অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নয়া সংশোধনী, সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার, ভাষার পরিবর্তন এবং আইনমন্ত্রীর অপরিপক্কতার কারণে পাস করতে দীর্ঘ ৬ ঘন্টারও বেশি সময় লেগে যায়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশোধনী বিলটি ২৬৮-০ ভোটে পাস হয়। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে অবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। তিনি একই সঙ্গে সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল যা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল নামে পরিচিত তাতে সম্মতি দেয়ার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।

খালেদা জিয়া সরকারের বিদায় ঃ

২৯ মার্চ দেশের সর্বত্র একটাই আলোচনা চলতে থাকে, প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে খালেদা জিয়া কখন বিদায় হচ্ছেন। অবশেষে ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের অপমানজনক পতন ঘটে। খালেদা জিয়া এদিন পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন, প্রধান উপদেষ্টা পদে শপথ নেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। শপথ অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার পদত্যাগের সংবাদের সাথে সাথে সারাদেশে আনন্দ বয়ে যায়। লাখো মানুষ উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। অনেকটা ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরের স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের মতোই ঘটনাটি ঘটে। বিরোধী দল ঘোষিত

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। ২৬ ও ২৭ মার্চ বিরতিসহ গত ৯ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২০ দিন অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়।

একটি সংবাদপত্র জনগণের বিজয় নিয়ে ৩১ মার্চ যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আট দিন ধরে জনতার মঞ্চকে ঘিরে রাখা জনতার অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। সময় তখন ৬টা ১০ মিনিট। তোপখানা রোডে জনতার মঞ্চ ঘিরে যতদূর দৃষ্টি যায় মানুষ আর মানুষ। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ঘোষণা করলেন, খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। জনসমুদ্রে যেন জোয়ার আসে। উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা। লাখো জনতা উন্মাতাল হয়ে নাচতে থাকে, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, জয়বাংলা ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে রাজপথ। উল্লাস থামার পর মাইকে আসেন জনতার মঞ্চের নায়ক মেয়র মোহম্মদ হানিফ। বিজয়ের আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। বিজয়ের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন হানিফ। মুহূর্তেই সে আবেগ ছড়িয়ে পড়ে গোটা জনসমাবেশে, কাঁদতে থাকেন সবাই। সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। এরপর পুরো সমাবেশ সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি .....।'

৩০ মার্চ, গভীর রাত পর্যন্ত জনতার মঞ্চে অনুষ্ঠান চলেছে। হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতা বিজয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে উপভোগ করেছে তা। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমাবেশে। জনতার বিজয়ে উদ্বেলিত সবাই। হানিফ তার বক্তব্যে বলেছেন, এ বিজয় কোনো দলের নয়, ব্যক্তির নয়; এ বিজয় জনতার এ বিজয় গণতন্ত্রের।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার হলে শপথ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৩১ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন ঃ

'সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। রেডিও টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে তিনি এ জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, দেশের মানুষ শান্তি চায়। আর তাঁর সরকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে মোটেও দ্বিধা করবে না। দেশবাসীকে তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, নানা কারণে দেশে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করলেও এ নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

জনাব রহমান সমাজ, রাজনীতি, নির্বাচন, মানবাধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরে বলেন, কল্যাণকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশাসনের জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত হলে। তিনি বলেন, মানবাধিকার সংরক্ষিত না হলে মানুষ অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহকেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৭০ সাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য এরকমই একটি সময় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন ও সংবিধান প্রণয়নে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করে। জনাব রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সংক্ষিপ্ত পটভূমি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা গ্রহণে তিনি খানিকটা সংশয়িত ছিলেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির উৎসাহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার আশ্বাস তাকে স্বস্তি দিয়েছে। জনাব রহমান বলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সদিচ্ছা ও সহযোগিতার যে আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করেছেন, দলগুলোর কর্মীরা যদি তাতে সাড়া দিয়ে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে তাহলে জাতিরই শুধু মঙ্গল হবে না, স্ব স্ব দলও উপকৃত হবে।

তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত যে শান্তি শৃঙ্খলা তা রক্ষায় তার সরকার আশঙ্কা বা বিচলিত বোধ করবে না। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধ দমন করা হবে। ফাউকে অহেতুক হয়রানি করা হবে না এবং সরকারের কাজ অসহ্য রকম দুরূহ না হলে বিশেষ আইন পারতপক্ষে ব্যবহার করা হবে না। এ ব্যাপারে তিনি আইনজীবীদের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, তারা যেন অযথা তারিখ মুলতবি করে সময়ের অপব্যয় না ঘটায়। আদালত বা প্রশাসন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার আশু তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানান। ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরে স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, নাগরিক কর্তব্য পালন এবংদিক থেকে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একাধিকবার দিকভ্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেবল ১১ জন উপদেষ্টা যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এজন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন পুরনো মন্ত্রণালয় নিয়ে হা-হুতাশ করলেও জীবন থেমে থাকে না। জাতীয় জীবনে কোনো কারণে রাজনৈতিক সূত্র ছিঁড়ে গেলে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই তার সংস্কার করতে হবে, ব্যক্তি জীবনে যেমন মাঝে মাঝে সুতা ছিড়ে গেলে তা সংস্কার করে জোড়া দিতে হয়।

শেখ হাসিনার বিজয়ী ভাষণ ঃ

৩১ মার্চ বিজয়ী নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'জনতার মঞ্চ' থেকে রূপান্তরিত 'বিজয় মঞ্চ' হতে এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতা হারিয়ে বিএনপি উন্মাদ হয়ে গেছে, জেলায় জেলায়, থানায় থানায় অস্ত্রধারীদের নামিয়ে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী, পুলিশের কাছে আমার অনুরোধ, এই মুহূর্তে থেকে অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার শুরু করুন। কারো কাছে যেন কোন অবৈধ অস্ত্র না থাকে তা নিশ্চিত করুন।

তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে ৫ বছর খালেদা জিয়ার সরকার কয়েক'শ মানুষকে হত্যা করেছে। পুলিশ ও মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনী প্রহসনেই কেবল ১শ ২০ জনকে হত্যা করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, এসব খুনের জন্য আমি খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করছি, বিচার দাবি করছি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

দৈনিক পত্রিকাসমূহ

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক সংবাদ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক আজকের কাগজ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক বাংলার বানী, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক বাংলা বাজার, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক জনতা, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক ভোর, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

দৈনিক খবর, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬

সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ৩০ আগস্ট, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১ জানুয়ারী, ১৯৯২।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১ জানুয়ারী, ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১ জানুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ঢাকা, ৪ঠা জুলাই, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক বাংলা বার্তা, ঢাকা, ২০ জানুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, ঢাকা, ১৪ জুলাই, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা, ৬ আগস্ট, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

DAILY PAPERS

Daily Star, Dhaka, May 15, 1996

Daily Star, Dhaka, January 1, 1993

Daily Star, Dhaka, Decmember 19, 1994

Daily Star, Dhaka, March 20-26, 1996

Daily Star, Dhaka, 1-3, 2000

Daily Star, Dhaka, December 1, 1996

The Independent, Dhaka, February 8, 1998

Bangladesh Observer, Dhaka, February 20, 1979

WEEKLY PAPERS & MAGAZINE

Holiday, Dhaka, November 23, 1990

Holiday, Dhaka, December, 1996

Holiday, Dhaka, January 11, 1997

Holiday, Dhaka, January 18, 1996

Holiday, Dhaka, February 15, 1997

Weekly Dhaka Courier, Dhaka, November 24, 1993

Weekly Dhaka Courier, Dhaka, March 13, 1993

Fer Eastern Economic Review, October 31, 1992

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

"বিএনপি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা" সম্পর্কিত জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ, সারসংক্ষেপ, উপসংহার ও সুপারিশমালা।

৬.১ জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৬.২ সার সংক্ষেপ

৬.৩ উপসংহার

৬.৪ সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ

অংশ গ্রহনকারীর নাম ঃ

বয়স ঃ

পেশা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

বয়সের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহনকারীর শতকরা হারঃ

বয়সের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহনকারী গবেষণা কাজকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। বিশেষত ৩০ উর্ধ্ব বয়সী লোকদের নিকট জরিপের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। কেননা এ গবেষণা কর্মটি অতীতের একটি রাজনৈতিক বিষয় হওয়ায় বর্তমানে যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তারা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। ১৯৯১-৯৬ সময়কালে যারা সচেতন ছিলেন বলে প্রতিভাত হয়, কেবল তাদেরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এজন্য ৩০ এর নিচে যাদের বয়স, তারা জরিপ থেকে বাদ পড়েছেন।

অংশগ্রহনকারীর বয়স	শতকরা হার
৩০-৪০	২০%
৪১-৫০	২২%
৫১-৬০	১৮%
৬১-৭০	২৫%
৭১+	১৫%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১ উত্তরদাতাদের বয়স কাঠামো

জরিপে মোট অংশগ্রহন করেন ১০০ জন। এর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ২০ জনের। ২২ জন অংশগ্রহন করেন ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সীমার মধ্যে। ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের মধ্যে যারা অংশগ্রহন করেন তাদের শতকরা হার ১৮। ৬১ থেকে ৭০ বছর বয়সী লোকদের অংশগ্রহন সবচেয়ে বেশী। শতকরা ২৫ জন অংশগ্রহন করেন এ বয়সসীমার ব্যক্তিবৃন্দ। আবার সবচেয়ে কম অংশগ্রহন ছিল ৭১ উর্ধ্ব বয়সীদের। কারন এদের অনেকেই হয়তো স্মৃতিভ্রম হয়ে থাকবেন। তাই তাদের সাক্ষাৎকার কম নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পেশার ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহনকারীদের শতকরা হার ঃ

জরিপে অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। বস্তুত জরিপ গবেষণা কর্মের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে নানান পেশাজীবী লোকদের অংশগ্রহন অপরিহার্য। এই গবেষণা কর্মেও যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়, সেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী লোকের শতকরা হার দেখানো হলো:

পেশার ধরন	শতকরা হার
শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী	৩৫%
চাকুরিজীবী (সরকারি ও বে-সরকারী)	২৫%
রাজনীতিবিদ	২২%
ব্যবসায়ী	১৩%
অন্যান্য	৫%
মোট	১০০%

টেবিল নং ২ ঃ উত্তরদাতাদের পেশার ধরন

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, জরিপে বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি মানুষ অংশগ্রহন করেছেন। শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আইনজীবীদের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহন বেশি। এই শ্রেনীর শতকরা অংশগ্রহন ছিল ৩৫। এরপর আছেন চাকুরিজীবীরা। তাদের অংশগ্রহন শতকরা ২৫ জন। চাকুরিজীবী বলতে সরকারী ও প্রাইভেট চাকুরী যারা করেন তাদের অংশগ্রহণ। তৃতীয় পর্যায়ে যারা রয়েছেন, তারা হলেন রাজনীতিবিদ। তাদের মতামত ছিল শতকরা ২২জন। এছাড়া ব্যবসায়ী সমাজের অভিমত নেওয়া হয়েছে, যাদের অংশগ্রহণ ছিল শতকরা ১৩ জন।

এছাড়া আরো শতকরা ৫ জনের মতামত পাওয়া গছে, যারা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। যেমন ঢাকা শহরের মধ্যবয়সী বাস ড্রাইভার ও রিক্সা চালক। নির্মান শ্রমিকও রয়েছেন এ অংশে। এছাড়া কিছু বিক্রেতারও অভিমত নেওয়া হয়েছে এখানে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘকাল পর ১৯৯১ সালে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৮%
না	১৮%
মন্তব্য নাই	৪%
মোট	১০০%

টেবিল নং-৩

এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল। মাত্র শতকরা ১৮ জন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না বলে মনে করে। এদের ধারনা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। কেননা, বাংলাদেশের মানুষের মাঝে তখনও সে রকম সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে থেকে বাংলাদেশ গনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি ছিল। স্বৈরচার বিরোধী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেগবান হতে থাকে। দেশে গনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য বিরোধী দলগুলো ৮ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট গঠন করে। অবশেষে স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী দলগুলোর তীব্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন হলে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তাদের দায়িত্ব ছিল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এই নির্বাচন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করলেও অনেকে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাই এই ভারিপের তার প্রভাব পড়ে। ১৮% লোক এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ মনে করেন না। আবার দেখা যায় যে, কিছু লোক (৪% লোক) মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৭৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের প্রশ্নে, সুক্ষ্ম কারচুপি বলে যে অভিযোগ তোলে তা কি আপনার সমর্থনযোগ্য।

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৫ %
না	৮৩%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

টেবিল নং -৪

এ প্রশ্নের উত্তরদাতাদের মধ্যে দেখা যায় যে, ৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন সুক্ষ্ম কারচুপি ছিল না। নির্বাচন হয়েছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ। তবে শতকরা ১৫ জন উত্তরদাতা এ প্রশ্নের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা মনে করেন যে, তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন তোলেন তা সঠিক ছিল। নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপি করেই আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা হয়েছিল বলে তাদের ধারণা। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে তাদের মতে আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় যেত। মাত্র ২% উত্তরদাতা মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। বস্তুত সুক্ষ্ম কারচুপির ব্যাপারে অধিকাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করলেও অনেকেই (১৫% উত্তরদাতা) তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়, তা কি আপনাকে আশাবাদী করে তুলেছিল?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৮%
না	৩৫%
মন্তব্য নাই	৭%
মোট	১০০%

টেবিল নং ৫

টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৫৮ জন উত্তরদাতা গণতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু শতকরা ৩৫ জন উত্তরদাতা তেমন আশাবাদী ছিলেন না। দীর্ঘ আন্দোলনের পর একটি জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে স্বভাবতই দেশের সকল আপামর জনতা আশাবাদী হওয়ার কথা ছিল। ৫৮% উত্তরদাতা গনতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী থাকলেও নিরাশাবাদী কিন্তু কম ছিলেন না। ৩৫% উত্তরদাতা এদেশে গনতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী তো ছিলেন না বরং তাদের কণ্ঠে হতাশার বানী শোনা গিয়েছিল। ৭% উত্তরদাতা গনতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী নাকি নিরাশাবাদী ছিলেন কোনো মন্তব্য করতেই রাজি হয়নি। নিরপেক্ষ থাকা উত্তর দাতাদের শতকরা কিন্তু কম নয়।

সংসদে বিরোধীদলকে পর্যাপ্ত কথা বলতে দেয়া হয়নি বলে আওয়ামী লীগের যে অভিযোগ, তা কি সঠিক ছিল?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৭%
না	২৯%
মন্তব্য নাই	৪%

টেবিল নং ৬

উপরের প্রশ্নের উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৭ জন হ্যাঁ এবং শতকরা ২৯ জন না মন্তব্য করেছেন। আর শতকরা ৪ জন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। গণতন্ত্রের সূচনালগ্নে, বাংলাদেশের জনসাধারনের প্রত্যাশা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হউক, সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থে ঐক্যমত পোষণ করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু দেখা গেল সংসদে হরহামেশা বাকবিতন্ডা

Dhaka University Institutional Repository

লেগেই আছে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে। কোনো ইস্যুতেই তারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারছেন না। অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে সংসদ সদস্যদের মাঝে অশ্লীল ও অশোভন ভাষার ব্যবহার হচ্ছে । স্পিকার বিরোধী দলের মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন, সরকারী দলের সদস্যদের সময় দিচ্ছেন বেশি। এসব অভিযোগে বিরোধী দল সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছেন। উত্তরদাতাদের অধিকাংশ (৬৭% উত্তরদাতা) বিরোধী দলের অভিযোগের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। কম হলেও ২৯% উত্তরদাতা বিরোধী দলের অভিযোগ সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত মিরপুর ও মাগুরার উপ-নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক ছিল?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৯%
না	১৬%
মন্তব্য নাই	৫%
মোট	১০০%

টেবিল নং ৭

এই প্রশ্নে বিরোধী দলের অভিযোগের প্রতি অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৭৯% জন হ্যাঁবোধক উত্তর দেন। মিরপুর ও মাগুরা উপ-নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বিরোধী দলের এই অভিযোগের প্রতি নাবোধক উত্তর আসে শতকরা ১৬ জন আর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন ৫% ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী মিরপুর (ঢাকা-১১) আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীয় কামাল আহমেদ মজুমদার। আর মাগুরা-২ আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি কর্মসূচি যুক্তিসঙ্গত ছিল কিনা?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৭%
না	৪১%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

টেবিল নং-৮

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বিরোধী দলগুলোর লাগাতার সংসদ বর্জনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন ৫৭% উত্তরদাতা। আবার ৪১% উত্তরদাতা বিরোধী দলের কর্মসূচিকে সমর্থন করেনি। এ প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন মাত্র ২% উত্তরদাতা। বস্তুত বিরোধী দলের বৃহত্তম আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করতে বাধ্য হয় তৎকালীন বিএনপি সরকার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে। এ দাবী সঠিক ছিল কিনা?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৩%
না	২৫%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

টেবিল নং-৯

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে বলে মন্তব্য করেছেন অধিকাংশ উত্তরদাতা। ৭৩% জন উত্তরদাতা মনে করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বয়ে নিয়ে আসবে। তবে

Dhaka University Institutional Repository

২৫% উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেননি। তাদের নাবোধক উত্তর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন, উঠারই শামিল। তবে এদের সংখ্যা বেশ কম। আবার দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও কিছু লোক (২% উত্তরদাতা) মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন।

বিরোধী সাংসদরা পদত্যাগের পর ৫ম সংসদের অধিবেশনগুলো বৈধ ছিল কিনা?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬১%
না	৩৭%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১০

এ প্রশ্নের উত্তরে জরিপে অংশ গ্রহনকারী অধিকাংশ হ্যাঁবোধক উত্তর প্রদান করেছেন। সংসদ অধিবেশনগুলো বৈধ ছিল বলে ৬১% উত্তরদাতা নির্দ্ধিধায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে বৈধ ছিল না বলেও ৩৭% উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর মাত্র ২% উত্তরদাতা কোনো মন্তব্য না করে চুপচাপ থেকেছেন। যারা বৈধ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তাদের যুক্তি হলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিএনপি'র ছিল। সুতরাং পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে যে সব বিল ও এ্যাক্ট পাস হয়েছে, তা বৈধ ছিল। বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্তকারীদের যুক্তি হলো যে, যেখানে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত সেখানে সংসদের কার্যক্রম বৈধ হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল ৫ম জাতীয় সংসদে পাস না করে এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাস করে স্বৈরাচারী মনোভাব পরিচয় দিয়েছে- মন্তব্যটি কি সঠিক?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৪%
না	২৩%
মন্তব্য নাই	৩%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১১

এ প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ উত্তরদাতাই বিএনপি সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেননি। ৭৪% জন উত্তরদাতা হ্যাঁবোধক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মতে বিএনপি সরকার স্বৈরচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। মাত্র ২৩% উত্তরদাতা অবশ্য এ ব্যাপারে নাবোধক উত্তর প্রদান করেন। তাদের মতে, সে সরকারের কার্যকলাপে স্বৈরাচারী মনোভাব ছিল না বরং বিএনপি সরকার বৈধভাবেই সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে। শতকরা ৩ জন কোনো মন্তব্য না করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল কি না?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৯%
না	৫১%
মন্তব্য নাই	১০%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১২

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের বৈধতার প্রশ্নে, হ্যাঁবোধক উত্তর প্রদান করেন ৩৯% উত্তরদাতা। ৫১% অর্থাৎ বেশির ভাগ উত্তরদাতা নাবোধক উত্তর প্রদান করেছেন। জরিপে অংশগ্রহনকারী বেশির ভাগ জনতা বৈধ ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ লক্ষণীয় যে, ১০% জন উত্তর দাতা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছেন। অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

Dhaka University Institutional Repository

যদি বৈধ থাকে তবে মেয়াদ শেষ করতে পারেনি কেন?

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল কি না-এ প্রশ্নের উত্তরে যারা বৈধ ছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন, তারাই সে সংসদ মেয়াদপূর্ণ করতে না পারার বিভিন্ন কারন বর্ণনা করেছেন। তাদের ১৭% মনে করেন যে, বিরোধী দলের তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি হতে না হয় সেজন্য বিএনপি সরকার তড়িঘড়ি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে সংসদ ভেঙ্গে দেয়। তাদের মতে, দেশে অরাজকতার আশংকা করেই বিএনপি এ কাজ করে। আবার তাদের মধ্যে ১৪% মনে করেন যে, সংসদ বৈধ ছিল কিন্তু বিদেশীদের চাপে তথা দাতাদের চাপের কারণেই সংসদের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হয়নি। এখানে অবশ্য দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৮% কোনো মন্তব্য করেন নি।

যদি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ হয়ে থাকে তবে উক্ত সংসদে পাসকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ ছিল। মন্তব্যটি সঠিক কি না?

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে যারা (৫১% উত্তরদাতা) বৈধ ছিল না বলে মন্তব্য করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই এ প্রশ্নের উত্তরে নিরব থাকতে দেখা গেছে। মাত্র ১১% মুখ খুলেছেন। তাদের মতে, সংসদ অবৈধ থাকলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি অবৈধ ছিল না। সংসদে যেহেতু বিএনপি'র আইন প্রনয়নের জন্য যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাই বিলটি অবৈধ নয়। বস্তুত নির্বাচন যেহেতু বিতর্কিত ছিল, সেজন্য অধিকাংশ সে সংসদকে অবৈধ বলে মন্তব্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি শাসনামলে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ১৭৩ দিন হরতাল কর্মসূচি যা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের উপর মারাত্মক বাজে প্রভাব ফেলে। হরতাল নামক কর্মসূচিকে আপনি গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করেন কিনা?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৮%
না	৮২%
মন্তব্য নাই	০%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১৩

এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ উত্তরদাতা হরতালের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সর্বাধিক ৮২% উত্তরদাতা হরতালকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করেন না। মাত্র ১৮% উত্তরদাতা গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হননি। তাই এখানে কাউকে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল এখন ব্যাধি হিসেবে জনগনের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। বিরোধী দলের হরতাল নামক কর্মসূচিতে দেশের অর্থনীতিকে যেমন করছে পঙ্গু, রাজনীতিতেও এসেছে চরম অস্থিরতা। জানমালের নিরাপত্তাও হচ্ছে চরমভাবে বিঘ্নিত। বস্তুত হরতাল জাতির উন্নয়নে চরম বাধা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রথম দিকে হরতাল রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও পরবর্তীতে এর সম্বন্ধে জনগনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জরিপের ফলাফল তা প্রমান করে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল সমর্থন যদি না করেন, তবে হরতালের বিকল্প কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

মন্তব্য	শতকরা হার
ঘেরাও কর্মসূচি	১৩%
মিছিল-মিটিং	১৫%
লং মার্চ	৩৫%
পদযাত্রা	২৭%
মানব বন্ধন	৬%
প্রতীক অনশন	৪%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১৪

হরতালের বিকল্প প্রশ্নে জরিপে অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন রকমের বিকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত টেবিলের বিকল্প পন্থা গুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, লং মার্চের পক্ষে সর্বাধিক মতামত ব্যক্ত করেছেন। ৩৫% উত্তরদাতা হরতালের বিকল্প হিসেবে লং মার্চকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর পরের স্থান পদযাত্রা। ২৭% উত্তরদাতা বিকল্প পন্থা হিসেবে পদ যাত্রাকে বেছে নিয়েছেন। এর পরের স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মিছিল-মিটিং ও ঘেরাও কর্মসূচি। যথাক্রমে ১৫% ও ১৩% উত্তরদাতা এ ব্যাপারে বিকল্প হিসেবে ভাবছেন। ৬% মানব বন্ধন কর্মসূচিকে হরতালের বিকল্প হতে পারে বলে মতামত প্রদান করেছেন। আর মাত্র ৪% প্রতীক অনশনের কথা বলেছেন। আবার অনেকে ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতামূলক মনোভাব থাকা অপরিহার্য নয় কি?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮৭%
না	১০%
মন্তব্য নাই	৩%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১৫

এ প্রশ্নের জবাবে দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক ৮৭% উত্তরদাতা পারস্পরিক সমঝোতামূলক মনোভাব থাকা অতীব জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন। মাত্র ১০% উত্তরদাতা নাবোধক উত্তর দিয়ে অবশ্য তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাদের মতে, সংসদে সব বিষয়ে সরকারী দল ও বিরোধী দলের সমঝোতামূলক মনোভাব থাকলে সরকারী দলের স্বৈরচারী হবার সম্ভবনা থাকে খুব বেশী। তাই সমঝোতামূলক মনোভাব থাকার সাথে সাথে বিরোধী মনোভাব অবশ্যই বিরোধী দলের মাঝে থাকতে হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে ৩% উত্তরদাতা কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

বিরোধী দলগুলো কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশই (৭৪% উত্তরদাতা) সহযোগিতামূলক ভূমিকার কথা বলেছেন। তারা এও বলেছেন যে, দেশের উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবশ্যই বিরোধী দলের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করবে এমন নীতি কোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্য শুভকর হতে পারে না। অবশ্য ১৮% উত্তরদাতা ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর ৮% উত্তরদাতা নীরব থেকেছেন এ ব্যাপারে।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল কিনা?

মন্তব্য	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩%
না	৫৩%
মন্তব্য নাই	৪%
মোট	১০০%

টেবিল নং-১৬

বেশির ভাগ উত্তরদাতা নাবোধক মন্তব্য করেছেন। ৫৩% জন উত্তর দাতা মনে করেন যে, আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। আওয়ামী লীগের সংসদ বর্জন, হরতাল, মিছিল-মিটিং, অসযোগ আন্দোলন ইত্যাদিকে তারা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন। এজন্য তারা আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। আবার অনেকে তাদের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন। যেমন ৪৩% জন উত্তরদাতা মনে করেন, আওয়ামী লীগ সংসদে সহযোগিতা ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারী দল তাদেরকে বাধ্য করেছে সংসদ বর্জনে, হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি গ্রহন করতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দল অনমনীয় থাকায় বিরোধী দল সংসদীয় সংস্কৃতি লালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ বিরোধী দল সংসদীয় সংস্কৃতি লংঘন করেনি। এখানে ৪% জন উত্তরদাতা কোনো মন্তব্য না করে নীরব থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ সারসংক্ষেপ ঃ

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং মতামত জরিপ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য গুলো পাওয়া গেছে। যথা ঃ

নির্বাচনের গ্রহনযোগ্যতাঃ

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রতি অধিকাংশ জনগনের ইতিবাচক ধারনা রয়েছে। দীর্ঘ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পর দেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত হয় অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অস্থায়ী তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন পরিচালনা করেন অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। দেশের সর্বসাধারণ ও বিদেশীরা এ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে আখ্যা দেন। সার্বিকভাবে এ নির্বাচন সবার গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করে। এখানে লক্ষনীয় যে, শুধু বিরোধী দল নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নতোলে। কিন্তু জরিপে মতামত প্রদানকারী অধিকাংশই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন, তোলেননি। বস্তুত বাংলাদেশ গনতান্ত্রিক ইতিহাসে এই নির্বাচনের গ্রহনযোগ্যতা সর্বজনবিদিত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গণতন্ত্রে আশাবাদী ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যই ছিল মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। স্বাধীনতার পর সে লক্ষ্যেই দেশ এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু কতিপয় দুস্কৃতিকারী সেনা অফিসারের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর রাজনীতিতে বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে দেশবাসী অতিষ্ট হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালে আবার ঘটে সেনা অভ্যুত্থান। জিয়াউর রহমান নিহত হলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেন।

দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার পুন:প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের জনগন আশায় বুক বাধঁতে শুরু করে। তারা গনতন্ত্র নিয়ে স্বপ্ন, দেখেন; যা জরিপের ফলাফল থেকে বেরিয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা ঃ

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসলে সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে নানা ইস্যু নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় মিরপুর উপ-নির্বাচন আর ১৯৯৪ সালে মাগুরা উপ-নির্বাচন। এ দুটো উপ-নির্বাচনের ফলাফল এতটাই বিতর্কিত ছিল যে, শুধু বিরোধী দলই এ ফলাফলকে প্রত্যাখান করেননি, সচেতন জনগণমাত্রই সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

ফলে ১৯৯৪ সালে থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলন চাঙ্গা করে তোলে তাতে জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশের সমর্থন রয়েছে। তবে বিরোধী দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সমর্থন করেননি। যেমন হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। আর বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন যে যুক্তিযুক্ত ছিল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তৎকালীন বিএনপি সরকার আইন পাস করে তা প্রমান করেছে।

বিএনপি'র স্বৈরাচারিতা ঃ

বিরোধীদলগুলোর আন্দোলন ছিল নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাসের দাবিতে। কিন্তু সরকারী দল বিএনপি বিরোধী আন্দোলনকে উপেক্ষা করেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নানাভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে কটূক্তি করেছেন। ৫ম জাতীয় সংসদ শেষ হলে আরেকটি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেয় বিএনপিসহ আরো কয়েকটি ছোট দল। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ বেশ কিছু বিরোধী দল ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন বয়কট করে। ফলে ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন সবার গ্রহন যোগ্যতা হারায়। বিএনপি সরকার তড়িঘড়ি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়। এভাবে বিএনপি স্বৈরাচারিতার পরিচয় দিয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশই মতামত ব্যক্ত করেছেন বিএনপির স্বৈরাচারিতার প্রতি নেতিবাচক মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে। বস্তুত বিএনপি যে কাজটি ৫ম জাতীয় সংসদে করতে পারতেন, তা নিয়ে যাওয়া হয় আরেকটি নির্বাচন করে নতুন সংসদে। এখানে বিএনপি শুধু স্বৈরাচারিতাই পরিচয় দেয়নি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনঃ

হরতাল বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে। বিশেষত: বিরোধী রাজনীতিবিদরা হরতালকে অধিকার আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। গনতান্ত্রিক অধিকার বলে প্রচারণা চালিয়ে থাকেন।

কার্যতঃ হরতাল দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিয়ে আসে নানা দুর্ভোগ্য, তাই হরতাল বন্ধের দাবী উঠেছে চারিদিক থেকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন হরতাল বন্ধের দাবী জানালেও বিরোধী দলে এসে হরতাল পরিহার করতে পারেনি । জরিপে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশই (৮২% জন উত্তরদাতা) হরতালকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মানেন না। সুতরাং এটা বোধগম্য যে, বর্তমানে হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির কোনো জনসমর্থন নেই।

হরতালের বিকল্প ভাবনা ঃ হরতালের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন আছে। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হরতাল সমর্থনযোগ্য নয় বা কাম্য নয় তেমনি হরতালের বিকল্প (যে কোনো কর্মসূচি যা জনসমর্থিত হতে হবে) থাকলে বিরোধী দল গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে পারে। সরকারের স্বৈরচারী কর্মকান্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে জরিপে অংশগ্রহনকারী যে সবের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ঃ লং মার্চ, পদযাত্রা, মিটিং-মিছিল, মানবন্ধন, ঘেরাও, প্রতীক অনশন ও ধর্মঘট প্রভৃতি। এ সব কর্মসূচি বিরোধী দলগুলো মাঝে মধ্যে পালন করতে পারে। অধিকাংশ উত্তরদাতা এগুলোর প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেছেন।

সহযোগিতা ও গঠনমূলক রাজনীতির প্রত্যাশা ঃ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে পনেরোটি বছর পেরিয়ে গেছে। তিন তিনটি সরকার অদল বদল হয়েছে। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মানসিকতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। সংসদে সরকারী দলের এমপিরা কথা বলার জন্য বেশি সময় পান। স্পিকার বিরোধী সাংসদের মাইক বন্ধ করে দেন নির্ধারিত সময়ের আগেই। পরস্পর কাদা ছুড়াছুড়ি এমনকি গালিগালাজ পর্যন্ত হয়ে থাকে যা মহান জাতীয় সংসদের পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল নানা অভিযোগ এনে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে থাকে। এমনকি অব্যাহতভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জন করে থাকে। এভাবে জাতীয় সংসদ পরিনত হয় শুধু সরকারী দলের এবং সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে জনমনে প্রশ্নজাগে। জরিপে অংশগ্রহনকারীরা গঠনমূলক রাজনীতির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেখানে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে পূর্ন সহযোগিতামূলক পরিবেশ থাকবে। সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে যার ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্নীত হবে।

৬.৩ উপসংহারঃ

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধী দলের গুরুত্ব, তাৎপর্য, কার্যাবলী ও ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। এ গবেষণা কর্মে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মে নানা তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে বিরোধী দলের ভূমিকা নির্ণয় ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ট দল দেশ শাসন করবে এবং বিরোধী দল সরকারের গৃহীত নানা কর্মকান্ড যা দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী তার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, বিরোধী দল সরকারের অপারগতা যত না তুলে ধরতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দাবি নিয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় হরতাল ও ধর্মঘট করেছে একের পর এক। স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন, অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, সাধারণ নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ গঠন এসব ঐতিহাসিক পটভূমির মাধ্যমে বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে এই সরকারের প্রতি মানুষের আশা ও প্রত্যাশা যেমন ছিল বেশি ঠিক তেমনি বিরোধী দলের প্রতিও কম প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু সংসদের কিছুদিন যেতে না যেতেই সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। সংসদ বর্জনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষ সরকারের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানায়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট অধিবেশন বসে ২২টি। অথচ বিরোধী দল এর অনেক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেনি। টানা ২২ মাস বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেছে। এভাবে দেখা যায় যে, সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে এবং সে সব আইনের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ সংবিধানের ৫৬(৬) ধারা অনুযায়ী ৩০০ নির্বাচিত আসন ও ৩০টি সংরক্ষিত আসন সম্মিলিতভাবে সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

জবাবদিহিতার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে বিরোধী দলের পদত্যাগে সেই ধারা আর বজায় থাকেনি।

বস্তুত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী দলের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিরোধী দলের সহযোগিতা কামনা করা। ঠিক বিরোধী দলেরও দায়িত্ব সরকারের কৃতকর্মের জবাবদিহিতা আদায় করে নেওয়া। কিন্তু ১৯৯১-৯৬ সময়কালে দেখা গেছে সংসদে বিরোধী দল অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত। ফলে সংসদে সরকারি দলের একক সিদ্ধান্তের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের কোনো বাধা ছিল না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে, বিরোধী দলের আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল' পাস বাহ্যত বিরোধী দলের জন্য ইতিবাচক মনে হলেও তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ও সমাজের উপর যে নেতিবাচক ফলাফল আপতিত হয় তা কি কম ক্ষতিকর! প্রকৃতপক্ষে সরকারী দলের অনমনীয়তাই কিন্তু বিরোধী পক্ষকে আগ্রাসী করে তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সরকার যদি খোলা মন নিয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসত, যদি সরকার নমনীয়তা প্রদর্শন করতে কার্পন্য না করত, তাহলে হয়তো বিরোধী পক্ষগুলোকে তীব্র আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হতো না। হয়তো দেশের রাজনীতিতে বিরোধীদের এমন ধ্বংসাত্মক মেজাজও দেশবাসীকে অবলোকন করতে হতো না। আর ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সালের বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো না।

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৯১-৯৬ সালে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতিবাচক রাজনীতির পেছনে সরকারী দল বহুলাংশে দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ সুপারিশমালাঃ

গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। সুপারিশগুলো সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়েরই জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে।

ঐক্যমত সৃষ্টিঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি খুবই কাঙ্খিত একটা বিষয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত্য থাকা খুবই জরুরী। কেননা, ঐক্যমত্য না থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অযথা কালক্ষেপন হয়।

সহনশীলতা প্রদর্শন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সহনশীলতা নেই বললেই চলে। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে মাঝে মধ্যেই সংসদ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এমনকি গালিগালাজ পর্যন্ত হয়ে থাকে সংসদে যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক। সংসদকে কার্যকরী করে তোলার জন্য, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য উভয় পক্ষকে একে অপরের বক্তব্য ধৈর্য্য সহকারে শুনতে এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী দলকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংঘাতের রাজনীতি পরিহারঃ জ্বালাও পোড়াও এর রাজনীতি পরিহার করতে হবে। যে কোনো বিষয়ে বিরোধী দলের উচিত আলোচনার টেবিলে বসা। সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তাই বলে সংঘাতের রাজনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় বিরোধী দলের।

এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা থাকতে হবে অগ্রগন্য। আলোচনার জন্য বিরোধী দলকে টেবিলে আনার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারী দলকে। অবশ্য এমতাবস্থায় বিরোধী দলকে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে।

সংকীর্ণতা পরিহারঃ বাংলাদেশে দেখা যায়, সরকারী দল সব সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এতে দেখা যায় বিরোধী দল অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন হয়। আর এভাবে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের। সংকীর্ণতা উন্নয়নের পথে বড় বাধা। অতএব সরকারী দল ও বিরোধী দলকে সংকীর্ণতা পরিহার করে উদারতা প্রদর্শন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়কেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা কর্তব্য। সরকার কিংবা বিরোধী দল কর্তৃক গণতান্ত্রিক রীতিনীতির লংঘন হলে পারস্পারিক বোঝাপড়া নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে সংবিধান লংঘন হলে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে রেষারেষির সৃষ্টি হয় এবং বিবাদের জন্ম নেয়। অতএব উভয় পক্ষকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে।

সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চাঃ এদেশে সংসদীয় রীতিনীতির লংঘন হয় চরমভাবে। বিশেষত সংসদ চলাকালীন সময়ে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, পরনিন্দা, গালিগালাজ এমনকি ধ্বস্তাধস্তি পর্যন্ত হয় যা সংসদীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। দেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে প্রয়োজন সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চা করা।

হরতালকে না বলুন ঃ বিশ্বায়নের যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশ যাচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে পিছিয়ে পড়ছে। বিরোধী পক্ষ হরতালকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, যা মোটেও কাম্য নয়। বর্তমানে হরতালের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সবাই সচেতন। অতএব হরতাল বন্ধের জন্য সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়কে ঐক্যমতে পৌছতে হবে যে, বিরোধী দলে গেলেও তারা হরতাল পরিহার করবে। দেশ ও জাতির স্বার্থে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে এক্যুনি **"হরতালকে না বলুন"** শ্লোগান দিতে হবে।

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ঃ সরকারী দল ও বিরোধী দল তাদের কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করবে। যেমন সংসদের ভেতরে তেমন বাইরেও। আমাদের দেশে জবাবদিহিতার বড় অভাব। সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়েরই কোনো কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা একটি দলকে সঠিক ভূমিকা পালনে বাধ্য করে। অতএব জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা খুবই জরুরী।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ঃ আজ সর্বত্র বিশ্বায়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন সরকারী দল ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়া। সরকারী দল ও বিরোধী দলের মাঝে সমঝোতা না থাকলে, সহযোগিতার মানসিকতা না থাকলে, বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করা খুবই কঠিন। অতএব সরকারী দল ও বিরোধী দলের উচিৎ সম্মিলিতভাবে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা ঃ বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিশ্বব্যাপী এখন অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজ করছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য সরকারী দল ও বিরোধী দলের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী

"বিএনপি'র শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার মূল্যায়ন" শীর্ষক এম. ফিল কোর্সের চাহিদা পূরনার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জরিপে অংশ গ্রহনকারীর নাম ঃ

বয়স ঃ

পেশা ঃ

শিক্ষাগতা যোগ্যতা ঃ

১। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘকাল পর ১৯৯১ সালে যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠিত হয়, তা কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

হ্যাঁ ❒ না ❒

২। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের প্রশ্নে, সুক্ষ্ম কারচুপির যে অভিযোগ তোলে তা কি আপনার সমর্থনযোগ্য?

হ্যাঁ ❒ না ❒

৩। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়, তা কি আপনাকে আশাবাদী করে তুলেছিল?

হ্যাঁ ❒ না ❒

৪। সংসদে বিরোধী দলকে পর্যাপ্ত কথা বলতে দেয়া হয় না বলে আওয়ামী লীগের যে অভিযোগ তা কি সঠিক ছিল?

হ্যাঁ ❒ না ❒

Dhaka University Institutional Repository

৫। বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটো উপ-নির্বাচন মিরপুর ও মাগুরায় ব্যাপক ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক ছিল?

হ্যাঁ ❐ না ❐

৬। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি কর্মসূচি যুক্তিসঙ্গত ছিল কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

৭। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে। এ দাবি সঠিক ছিল কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

৮। বিরোধী সাংসদরা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলো বৈধ ছিল কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

৯। বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল ৫ম জাতীয় সংসদে পাস না করে একটি অগ্রহযোগ্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাস করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে- মন্তব্য কি সঠিক?

হ্যাঁ ❐ না ❐

১০। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

১১। যদি বৈধ থাকে তবে মেয়াদ শেষ করতে পারেনি কেন?

১২। যদি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে অবৈধ হয়ে থাকে তবে উক্ত সংসদে পাসকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ ছিল। মন্তব্য সঠিক কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বিএনপি শাসনামলে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত ১৭৩ দিন হরতাল কর্মসূচি যা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। হরতাল নামক কর্মসূচিকে আপনি গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করেন কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

১৪। যদি না করেন, তবে হরতালের বিকল্প কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

বিকল্পগুলো হলোঃ

- ঘেরাও কর্মসূচি
- মিছিল-মিটিং
- লং মার্চ
- পদযাত্রা
- মানববন্ধন
- প্রতীক অনশন
- ধর্মঘট
- অন্যান্য

১৫। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতামূলক মনোভাব থাকা অপরিহার্য নয় কি?

হ্যাঁ ❐ না ❐

১৬। বিরোধী দলগুলো কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে বলে আপনি মনে করেন?

১৭। বিএনপি শাসনামলে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল কি না?

হ্যাঁ ❐ না ❐

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আহমেদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা, ঝিনুক প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০২।

আহমেদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু কথা ও কথকতা, মৌলি প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০, ১৯৯৯।

আহমেদ ইয়াসমিন ও রাখী বর্মন ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, অজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪।

আহমেদ আবুল মনসুর ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮

আলম আলহাজ্ব বদিউল ঃ রাজনীতির সেকাল একাল, প্রসঙ্গ; বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রকাশক অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ, নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম ১৯৯৬।

আহম্মদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ "গণতন্ত্র" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৭।

আহমেদ কামাল উদ্দিন ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা "গণতন্ত্র" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯০-৯৪।

উমর বদরুদ্দিন ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭।

কাইয়ুম আব্দুল ঃ সংঘর্ষের রাজনীতি, মরমী প্রকাশনী, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ১৯৯৯

কামাল মোস্তফা ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, মুন্নী প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ১৯৯৬।

কামাল আহমেদ ঃ কালের কল্লোল-বাংলাদেশ (১৯৪৭-২০০০), মৌলি প্রকাশনী; ৩৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯০।

করিম সরদার ফজলুল ঃ গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা গণতন্ত্র সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫।

খান মিজানুর রহমান ঃ সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৮।

চৌধুরী মিজানুর রহমান ঃ রাজনীতির দিনকাল, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, গুলশান, ঢাকা-১২০৭, ২০০১।

চৌধুরী দীপক ঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা, মম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দিন খান ঃ খালেদা জিয়ার জেহাদ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

ফিরোজ জালাল ঃ পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

বালা হীরা লাল ঃ বাংলাদেশের দারিদ্র, অতীত ও বর্তমান, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

মতিন আব্দুল ঃ খালেদা জিয়ার শাসনকাল, একটি পর্যালোচনা, রেডিয়্যান্স এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুহাম্মদ আনু ঃ শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতিমূলক হতে পারে, দৈনিক খবর, ১৯৯৪।

মুহাম্মদ আনু ঃ গণতন্ত্র সংবিধান ও অর্থনীতি বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

মিয়া এম এ ওয়াজেদ ঃ বাংলাদেশ রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৫।

রহমান শামসুর ঃ রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয় আশ্রয় না হয়, বাংলার বানী, ঢাকা, ১৯৯১, ৩রা নভেম্বর, পৃষ্ঠা ৪।

রহমান তারেক এসটি ঃ সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।

রহমান এ এইচ এম আমিনুর ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার প্রকৃতি ও প্রত্যাশা, সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা-৪৯, ১৯৯৩।

রহমান আতাউর ঃ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রনায়ন ২৫ বছরের মূল্যায়ন, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

রহমান সাঈদুর ঃ অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে বাংলাদেশ, মৌলি প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০০।

শহিদুল্লাহ এ,ফে,এম ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, সম্পাদনা এমাজউদ্দিন আহমদ, বরিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১২০৭, ১৯৯২।

হাসিনা শেখ ঃ আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

হান্নান মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৯০-১৯৯৯), মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০০।

হোসেন আমজাদ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, প্রকাশক কবির আহম্মদ, পড়ুয়া, ৪৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৯৬।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আব্দুল ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট, প্রকাশক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৬ কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২২।

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ ঃ পালামেন্টারী কমনটি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, রিজিওনাল স্টাডিজ ১৩ (১) ১৯৯৩-১৯৯৪।

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ ঃ ওভার ডেভেলপড..... পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ ক্রাইসিস অব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সম্পাদনা, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল ঃ গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, ১৬ কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৯১।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল ঃ শেখ হাসিনার অমর কীর্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, সাকো ইন্টারন্যাশনাল, আমিনকোর্ট, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০।

হোসেন মইনুল ঃ অনেক কিছুই ভুলতে হইবে, অনেক কিছুই শিখিতে হইবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৪ই মে, ১৯৯৪।

Alin Ran Wick & Lan Swinburn: Basic Plotical Concept, Hufichinmon & Company 1983, Page-96.

Ahmed Moudud : Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL.

Ahmed Moudud : Bangladesh Conditional Quest for Autonomy, UPL-1979.

Ahmed Moudud: Crisis of Democracy in Bangladesh, Holiday, October 18, 1997, P-3.

Ahmed Kamruddin: A Socio Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh.

Azad Maulana Abul Kalam: India Wins Freedom, Orient Longman, New Delhi, 1989.

Ahmed Sirajuddin: Sheikh Hasina Prime Minister of Bangladesh, golam Mustafa, Hakkani Publishers, 1999, Page-132.

Ahmed Imtiaz: State & Foreign Policy: Indians role in South Asian, Academic Publishers 1993, PP 209-304.

Dhaka University Institutional Repository

Birch H. Anthoney: The British System of Government, Allan Union, London 1986.

Ball Allan: Modern Politics & Government, The Macmilan Press Ltd. ed. 1977. Printed in Great Britain. By Richard Clay Limited, Beng way, Suffolk, P-56.

Bather and Harvey: The British Constitution.

Chowdhury G.W.: The last Days of United Pakistan, Churst, London, 1974.

Chowdhury Nazma: The Legislative Process in Bangladesh, Politics & Functioning of the east Bengal legislature, 1947-58, UPL, Dhaka, 1980.

Emerson Rupert: From empire to nation, Boston : Beason Press, 1960, P-94

Finer S E: The Theory and practice of Modern government, London, Pal Mall Press, 1962, P-592.

Frank Andre Gunder: Development of Under Development in Charles K Illber(ed) "The Political Economy of Under development. New York, Random House, 1973.

Gettle R.G: Political Science, World Press, Calcutta, 1950, Page-199.

Harun Shamsul Huda: Bangladesh Voting Behavioral A Psychological Study 1973, UPL, April, 1986, P-230.

Haider Jaglul: Parliamentary Democracy in Bangladesh : Structures and Function, Congressional Studies Journal, Vol. 2, No. 1, January, 1994.

Haider Jaglul: Ethnic Problem in Bangladesh: A case study of Chakma Issue in the Chittagon Hill Tracts, The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, No. xiv, 1982, PP : 56-79.

Harun Shamsul Huda: Parliamentary Behavior in a Multinational state 1947-58: Bangladesh Experience, Asiatic Society of Bangladesh, 1984.

Islam M Nazrul: The Politics of National Integration in new states: A comparative study of Pakistan & Malaysia 1957-1970. PhD discretion, Griffith University, Australia, 1981,

Islam M Nazrul: Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment, Perspective in Social science review, Vol. 5, No. 1, 1997, Page-5.

Jennings Ivor: Cabinet Government, Cambridge University Press, 1961, P-16.

Jennings Ivor: The British Constitution, Cambridge University Press, New York, 1950, P-65.

Jahan Rounaq: Bangladesh Politics Problems and Issues, UPL Ltd. 1980.

Dhaka University Institutional Repository

Jahan Rounaq: Pakistan Failure in National Integration, Columbia University Press, New York 1972.

Kahn Rahman Zillur: Leadership Crisis in Banglaesh; Dupl, 1984, Red cross Building, Motijheel C/A, P-167.

Laski Harold J. : Democracy in crisis, London, George Allenand & Union Ltd. 1933.

MacIver R.M: The Modern State, London Oxford University Press, 1964, Page-399.

Monirujjaman Talukder: The Bangladesh Revolution and its aftermath, UPL, Dhaka, 1983,

Mohammad Anu: Economics of the world bank : growing resources increasing deprivation, Holiday, December, 1995.

Mascarenras Anthony: Bangladesh a Legacy of Blood, London, 1986.

Narien Verendra: Foreign Policy of Bangladesh (1979-81) Hauoyr Helekh Publishers, 1987, P-207.

Pye Lucian: Aspect of Political development, Little Brown and Company Boston, 1966, P-68.

Sabur AKM Abdus: Some Reflections on the Dynamics of Bangladesh Indian Relations in Iftekharujjaman & Imtiaz Ahmed (ed) Bangladesh and SAARC issues Perspective and out look : Dhaka Academic Publishers, 1992, P-150.

Sayeed K.B: Pakistan The Formartine Phase, 1975-1998 London, Oxford University Press.

Yong Koland: The British Parliament, 1967, Page-22.